শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত দখিনা

বিষয়- "বাংলা ভাষা" সালে "২০৫০"

নতুন প্রজন্ম ও প্রযুক্তির হাত ধরে
আগামী দিনের বাংলা ভাষা

বিশেষ সংখ্যা ২০১৯

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

আনন্দধারা

"আনন্দধারা রিডার্স ফোরাম" এর একটি প্রয়াস

anandodhara.com
fb.com/AnandodharaWeb
srimantasydney@gmail.com

সম্পাদনায়
শীর্ষেন্দু মুখোপধ্যায়

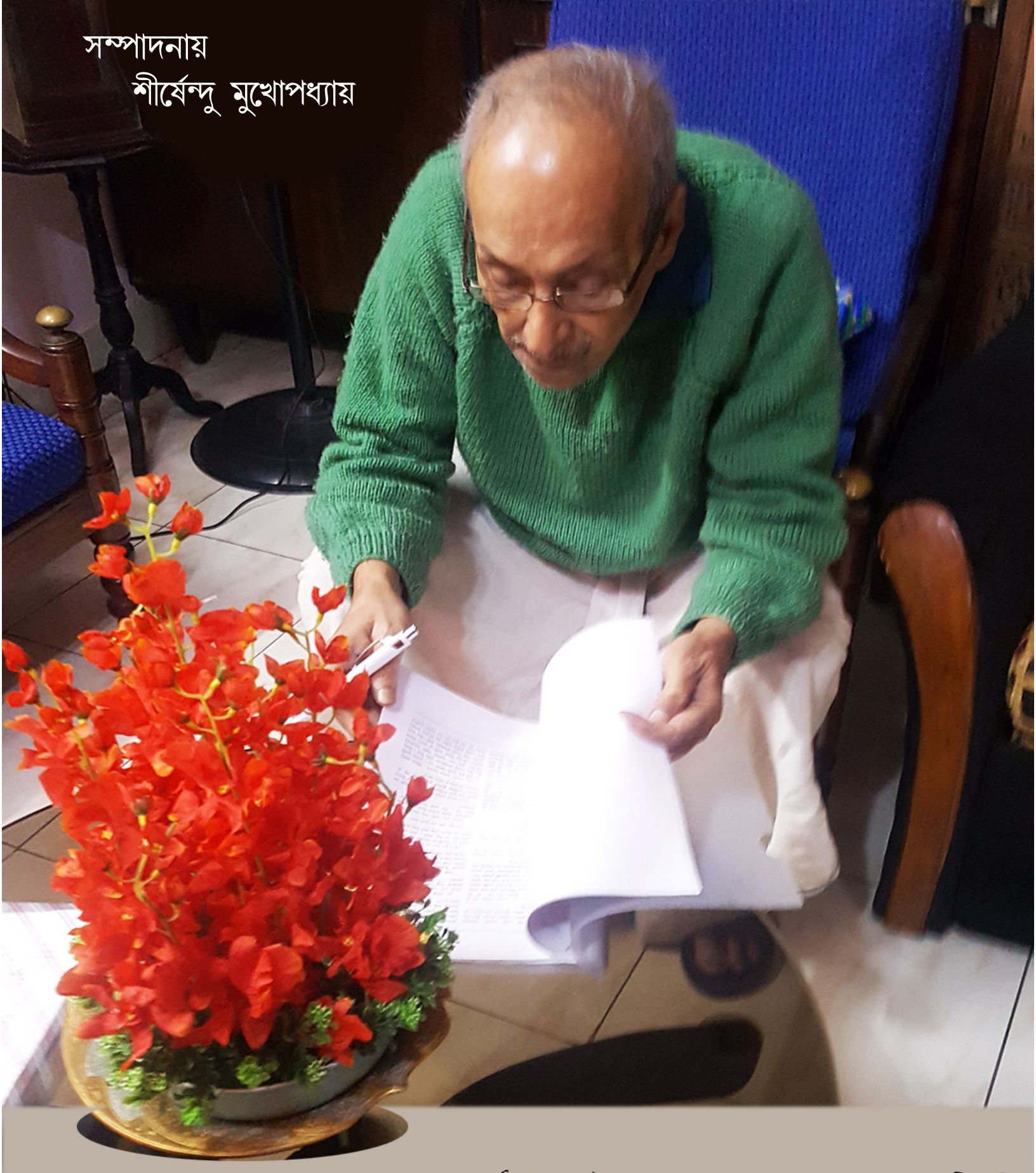

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এর আশীর্বাদধন্য "আনন্দধারা" !

"দখিনা" পত্রিকা সম্পাদনার কিছু মুহূর্ত এবং "প্রস্তুতিবিহীন একটি সাক্ষাৎকার"

চিন্তাটা অনেক দিন ধরেই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে ! ফেসবুক, হোয়াটস আপ, গুগল ট্রান্সলিটারেশন এ বাংলা ইনপুট, ছবি, মিউজিক, এস.এম.এস সব মিলিয়ে আক্ষরিক অর্থেই বাংলা অক্ষরগুলো কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে আমার ! তার ওপর দেশে বাংলা মাধ্যমে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া নাকি এখন প্রায় উঠে যাচ্ছে ! চারিদিকে কেমন জেনো একটা থমথমে ভাব বাংলা ভাষা ঘিরে ! বিভিন্ন বয়সের কয়েকজনের সাথে এই বিষয়ে কথা বলে বিভ্রান্তিটা আরও বেড়ে গেলো। জানতে ইচ্ছে করছিলো অন্যরা কি ভাবছেন এই নিয়ে ! ভাবের বাহন ভাষা ! ভাবটাই তো আসল ! তাহলে আগামী প্রজন্মের বাঙালীর মধ্যে বাংলা ভাবটাও কি হারিয়ে যাবে ? তারা কি স্বপ্ন দেখবে না বাংলায় ? আধুনিক বাঙালি খাবার সময় তো দেখি শিকড়ের টানে আটকা পড়ছে তাহলে ভাবার সময় কেন নয় ? নানা প্রশ্ন নানা মত ! এরই মধ্যে ২০১৮ জুলাই মাসে বাংলা সাহিত্যের অগ্রণী সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এর অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রস্তাব এলো ! আমরা ভাবলাম এই একটা সুযোগ ! শীর্ষেন্দু'দার অট্রালিয়া আগমন উপলক্ষ্যে আনন্দধারা রীডার্স ফোরাম এর ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিতব্য "দখিনা" পত্রিকার একটা বিশেষ সংখ্যা যদি এই বিষয়ের ওপর করা যায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এর সম্পাদনায় তাহলে তো দারুন হয় ! বহু লেখক লেখিকা অংশগ্রহণ করবেন আর শীর্ষেন্দু'দার এই বিষয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী এবং বক্তব্য সকলে জানতে পারবো ! শুরু হয়ে গেলো কাজ ! ইচ্ছে ছিল ১৫ই জুলাই ২০১৮ শীর্ষেন্দু'দা নিজে হাতে "দখিনা" উদ্বোধন করবেন সিডনীতে ! অনিবার্য কারণে শীর্ষেন্দু'দার ২০১৮ জুলাই এর অষ্ট্রেলিয়া সফর সম্ভব হয় নি !

১২ই জানুয়ারী ২০১৯ – স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৫ তম জন্মোৎসব পালনে ব্যস্ত সারা দেশ ! কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় রিক্সা, ম্যাটাডোরে, ব্যানারে বিবেকানন্দের ছবি আর তার সাথে সারি দিয়ে কচি কাঁচা আর বড়দের সম্মিলিত প্রভাত ফেরী ! সেই সবের পাশ কাটিয়ে শীতের আমেজ গায়ে মেখে "তথাগত মুখার্জী" আর আমি হাজির হলাম দক্ষিণ কলকাতার যোধপুর পার্কে বাংলা সাহিত্যের চলমান মহীরূহ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এর বাড়ীতে ! উদ্দেশ্য শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত দখিনা পত্রিকার চূড়ান্ত খসড়া ওনার কাছ থেকে সংগ্রহ করা এবং সেই সুযোগে শীর্ষেন্দু'দার নিজের মুখে কিছু কথা শোনা !

দরজা খুললেন হাসিমুখে শীর্ষেন্দু'দা নিজেই ! কুশল বিনিময় এবং প্রণাম পর্ব শেষে সদাপ্রসন্ন শীর্ষেন্দু'দা উঠে গিয়ে দেড়'তলার লেখার ঘর থেকে নিয়ে এলেন প্লাস্টিক ফাইলে মোড়া দখিনা'র লেখাগুলো ! তারপর আমাদের সামনেই "দখিনা" সম্পাদনার বাকি থাকা কিছু টুকিটাকি কাজ শেষ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ! আমি আর তথাগত নীরবে মুগ্ধ হয়ে দেখছি শীর্ষেন্দু'দা ডুবে গেছেন "২০৫০ এর বঙ্গসাগরে" ! "বিষয় – বাংলা ভাষা সাল ২০৫০" নিয়ে "দখিনা'র লেখকদের লেখার মাঝে একাত্ম হয়ে !" কখনো মুখে মৃদু হাসি, কখনো সংশয়, কখনো উজ্জ্বল হয়ে ওঠা গভীর দুটি চোখে সপ্রশংস বাহবা আবার কখনো বা একটু বিরক্তি আর হতাশা !

হঠাৎ দেখি আমার পায়ের পাতায় একটা চাপ পড়ছে ! কি হলো ব্যাপারটা ? তাকিয়ে দেখি "তথাগত" আমার পায়ে চাপ দিয়ে ঈশারা করে চাইছে আমার অনুমতি ! আর ওর হাতে রয়েছে প্রস্তুত "মোবাইল ফোন" ছবি আর ভিডিয়ো তোলার জন্য ! উভয় সংকটে পড়ে আমার অবস্থাও তথাগত'র মতো তথৈবচ ! কি যে করি ? সামনে রয়েছেন "দখিনা" সম্পাদনার কাজে আত্মসমাহিত বাংলা সাহিত্যের চলমান প্রবাদ পুরুষ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় আর তার সামনে আমরা দুটি মুগ্ধ, বাক্যরহিত ক্ষুদ্র প্রাণী এই অসামান্য মুহূর্তগুলো ধরে রাখার জন্য ব্যাকুল !

অনুমতি চাইতে কথা বলে শীর্ষেন্দু'দার মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটানোর মতো ধৃষ্টতা কল্পনাতেও আসে না ! ভাবলাম যাক বিনা অনুমতিতে ছবি বা ভিডিয়ো তোলার জন্য শীর্ষেন্দু'দার কাছে পরে ক্ষমা চেয়ে নেবো বা ছবি,

ভিডিওগুলো মুছে দেব ওনার আপত্তি থাকলে ! কিন্তু এমন সুযোগ তো আর পাওয়া যাবে না ! দূর্গানাম স্মরণ করে তথাগত'র দিকে তাকিয়ে বাঁ চোখটা একটু ছোট করলাম – মানে সোজা বাংলায় যাকে বলে "চোখ মারা" ! ব্যস – নিঃশব্দে একগাল হেসে তথাগত'বাবু নেমে পড়লেন ছবি আর ভিডিয়ো তোলার কাজে !

সম্পাদনার কাজে নিমগ্ন শীর্ষেন্দু'দার সামনেই বসে আশা, আশংকা আর অপরাধবোধে ত্রিশঙ্কু অবস্থায় আমি কাঠের পুতুলের মতো কাটিয়ে দিলাম অনেকটা সময় ! সম্বিৎ ফিরলো শীর্ষেন্দু'দার এক স্বস্তির নিঃশ্বাস এবং স্বগতোক্তিতে ! কলমটা দখিনার প্লাস্টিক ফাইলের পাশে রাখতে রাখতে ঐ দিকে তাকিয়েই বললেন "যাক দখিনার সম্পাদনা পর্ব সমাপ্ত" ! এবার মুখ তুললেন ! তখনো তথাগত'র মোবাইল ওনার দিকে তাক করা ! আমার তো বুক ঢিপ ঢিপ করছে !

হেসে ফেললেন শীর্ষেন্দু'দা ! শিশুসুলভ সারল্যে বললেন "ও মা তোমরা ছবি তুলছো ! রেকর্ড করছো ! আগে বলবে তো" ! রাগ বা বিরক্তির লেশ মাত্র নেই ! আছে শুধু একটু স্নেহমাখা কপট অভিমান ! আমি আর তথাগত তো তখন আনন্দে উৎফুল্ল ! সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম "শীর্ষেন্দু'দা আমরা তো আজ কোন রেকর্ডিং এর প্রস্তুতি নিয়ে আসিনি তবে আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে কয়েকটা বিষয়ে আপনার মতামত আমরা এখন মোবাইলে রেকর্ড করতে পারি ! পরে "আনন্দধারা" ওয়েবসাইটে আপনার সম্পাদিত এই "দখিনা" পত্রিকা যখন প্রকাশিত হবে তখন এই ছবি এবং সাক্ষাৎকার আমরা শেয়ার করব সকল সাহিত্যপ্রেমীদের জন্য এবং আপনার ভক্তদের জন্য !

শীতের আবহাওয়ায় রুক্ষ হয়ে যাওয়া দাড়ি না কামানো গালে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন "তা তোমরা করতে পারো ! তবে একটা শর্ত আছে ! তোমাদের ক্যামেরা যেন শুধু আমার কোমর থেকে ওপরের অংশের ছবি নেয় ! তোমরা তো কোন কিছু বলে কয়ে আসোনি যে রেকর্ড করবে তাই আমিও প্রস্তুত নই ! এখন তো আমি লুঙ্গি পরে আছি !"

আমি আর তথাগত হাতে চাঁদ পাওয়ার প্রতিক্রিয়ার ঢং এ ঝাঁপিয়ে পড়ে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ বলে রাজী হয়ে গেলাম !

বহু ত্রূটি বিচ্যুতিসহ অপেশাদারী, অপ্রস্তুত হাতে তোলা ছবি ও ভিডিও নিয়ে গাঁথা কিছু অবিস্মরণীয় মুহূর্তের এই মালা আপনাদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে ভালো লাগবে এই আশা করি !

এই হলো "প্রস্তুতিবিহীন একটি সাক্ষাৎকার" এর নেপথ্য কাহিনী !

ছবি এবং সাক্ষাৎকার উপভোগ করুন

শ্রীমন্ত মুখার্জী এবং তথাগত মুখার্জী
আনন্দধারা রীডার্স ফোরাম এর পক্ষ থেকে
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
২১শে ফেব্রুয়ারী ২০১৯

– কৃতজ্ঞতা স্বীকার –

বহু প্রতীক্ষার পর শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "দখিনা" পত্রিকা প্রকাশ হতে চলেছে ! এই বিশেষ সংখ্যায় রয়েছে অষ্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ এবং আমেরিকার আগ্রহী লেখক লেখিকাদের অত্যন্ত সুচিন্তিত এবং চমকপ্রদ কিছু লেখা ! বিষয় "বাংলা ভাষা – সাল ২০৫০" !

১৫ই জুলাই ২০১৮ থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারী ২০১৯ অনেকটা সময় ! শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "দখিনা" পত্রিকা প্রকাশের এই অনিবার্য বিলম্ব সংবেদনশীলতা এবং সহানুভূতির সঙ্গে মেনে নিয়ে আগ্রহভরে ভরে অপেক্ষা করবার জন্য "দখিনা" পত্রিকার প্রত্যেক লেখক, লেখিকা এবং পাঠকদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ !

সেই সঙ্গে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই "আনন্দধারা" কলকাতা অধ্যায়ের কান্ডারী তথাগত মুখার্জী কে বিগত ছ'মাস ধরে শীর্ষেন্দু'দার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে এবং "দখিনা'র জন্য প্রেরিত লেখাগুলোর পান্ডুলিপি এক এক করে ওনার হাতে পৌঁছে দেবার জন্য !

আর আছেন সর্ব বিষয়ে অগ্রণী এবং অফুরন্ত উৎসাহ, উদ্দীপনার "পাওয়ার হাউস" আমাদের সকলের প্রিয় "জানলা'দিদি" মানে "বাতায়ন" পত্রিকার কর্ণধার অনুশ্রী ব্যানার্জী ! অনুশ্রী'দির উৎসাহ, প্রেরণা এবং তাড়নাতেই বাধ্য হয়ে আমার লেখা !

কৃতজ্ঞতা জানাই বন্ধু শিবাজী মিত্র এবং তার প্রতিষ্ঠান "অ্যানব্লিক" এর পুরো টীমকে যারা আন্তরিকতা এবং মমত্ববোধের সাথে আনন্দধারার সকল কাজে অংশ নিয়েছেন !

ধন্যবাদ জানাই আই-ক্লিক স্টুডিয়োর রুবাই হুদা কে যিনি তার সৃষ্টিশীল ভিডিয়োগ্রাফি এবং ক্যামেরার প্রয়োগে আনন্দধারার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবি এবং ভিডিয়োকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছেন !

আমরা কৃতজ্ঞ বাংলা সাহিত্য সংসদ (মেলবোর্ণ) এর সকলসদস্যের কাছে যাঁদের আমন্ত্রণে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এর ২০১৮ সালের জুলাই মাসে দ্বিতীয়বার অষ্ট্রেলিয়া সফরের আয়োজন হয়েছিল ! যদিও অনিবার্য কারণে তা হয়ে ওঠেনি !

সর্বশেষে সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং চিরঋণী কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়'কে ! তাঁর ২০১৮ জুলাই মাসের অষ্ট্রেলিয়া সফর বাতিল হওয়া সত্বেও ঐ আগমণ উপলক্ষ্যে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিতব্য আনন্দধারা'র বিশেষ সংখ্যা "দখিনা"র সম্পাদনা করতে রাজী হয়েছেন বহু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ! আমাদের অনুরোধে ওনার এই সাড়া দেওয়া এক দৃষ্টান্তমূলক অধ্যায় হয়ে রইল সকলের কাছে !

আপনারা সুস্থ থাকুন আনন্দে থাকুন

শুভেচ্ছান্তে

শ্রীমন্ত মুখার্জী
আনন্দধারা রীডার্স ফোরাম এর পক্ষ থেকে
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
২১শে ফেব্রুয়ারী ২০১৯, সিডনী

সূচীপত্র

মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ ও কালান্তর
দীপক দাশগুপ্ত ২

ফিরে দেখা, — ২০৫০
মানস ঘোষ (পশ্চিমবঙ্গ, ভারত) ৭

এমন হলে কেমন হবে ?
সিদ্ধার্থ দে ১২

বাংলা ভাষা ২০৫০ — নবীন প্রজন্ম ও নতুন প্রযুক্তির হাত ধরে
শাশ্বতী বসু ১৪

হারান মাস্টারের কষ্ট
রবিরশ্মি ঘোষ ১৯

ভাষা
স্বর্ভানু সান্যাল ২২

বাংলা ভাষার বিবর্তন ও ২০৫০ সালের কল্পচিত্র
খন্দকার জাহিদ হাসান ২৫

ভাষা এমন কথা বলে
রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায় ২৯

ভেলায় ভেসে
স্নেহাশিষ ভট্টাচার্য ৩২

বাংলা ভাষা ২০৫০
সৌমিত্র চক্রবর্তী ৩৫

আগামীর বাংলা ভাষা
শমীক চক্রবর্ত্তী ৩৬

বুঝহ রসিকজন, যে জানো যেমন
ডালিয়া নিলুফার চৌধুরী ৩৭

মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ ও কালান্তর

দীপক দাশগুপ্ত

বেশকিছু কাল আগের কথা . . . . . আমাদের শিক্ষাগুরুর কাছে দাদা স্থানীয় বন্ধু মৃত্যুঞ্জয়দা এসে বলল — 'একটা শুভ খবর দিতে এলাম, আমার এক কন্যাসন্তান হয়েছে । আপনাকে কিন্তু নামকরণ একটা দিতে হবে যাতে সেটাই ওর জীবনে আশীর্বাদ হয়ে ওঠে ।'

মনোরঞ্জন বাবু সস্নেহে হেসে বললেন — 'বাঃ দারুণ খবর দিলে মৃত্যুঞ্জয় । তবে আমি একটা ডাকনাম দেব । ভালো নামটা তোমরা ঠিক কোরো । তুমি নিজে একজন খুব বড় আর্টিস্ট । তোমার এই মেয়েও একজন প্রতিভাধর শিল্পী হবে । দেখ, রবিঠাকুর, শরৎচন্দ্র, এঁনারা চার অক্ষর দিয়ে সব শুভ নাম গুলো শেষ করে দিয়েছেন । এযুগে তাই দু-অক্ষরের নামও খুব চালু হয়ে গেছে । আমি ওর নাম দিলাম এক অক্ষরে — 'টুং' । এই নামে ডাকলে ওর মধ্যে একটা ছন্দ জাগবে ।'

জানিনা কাকতলীয় কিনা, তবে ঋষিচেতনায় যা ধরা দেয়, তা সত্য হতে বাধ্য । টুং বা মধুবনী আজ এক প্রথিত যশা নৃত্যশিল্পী শুধু নয় ও নানান আর্ট ও সাহিত্যেরও প্রকৃতগুণী একজন ।

পিতৃসম শিক্ষাগুরুকে সেদিন আমার প্রশ্ন ছিল, একটা শব্দ বা ধ্বনির কী এমন মাহাত্ম্য যা সত্তাকে ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করে । তিনি বলেছিলেন, উপনিষদের একটা শ্লোকের কথা . . . . 'বাকেব ব্রহ্ম' । অর্থাৎ, শব্দই ব্রহ্ম । এই শব্দ হল ধ্বনি-মাত্রা । আর মানুষের কণ্ঠ থেকে উত্থিত বাক এই শব্দের নিম্নতম ভিত্তি ।

কারণ এর সাথে মনোভাব (ভাব) বা অর্থ জড়িয়ে আছে নিজেকে প্রকাশও ভাবের আদান-প্রদানের জন্য । কথা উচ্চারণ করার আগে আসে চিন্তা, যা প্রকাশ করি ভাষায় । আর বর্ণমালা না থাকলে ভাষা হয় না । বাকের মধ্যে হৃদয়ের সঞ্চিত বায়ু থেকে প্রাণশক্তি আর মস্তিষ্কের মানস আকাশ থেকে মনন শক্তি এ দুইই আছে । ঋষিচেতনায় এই বর্ণমাতৃকা যেমন নাভি দেশ থেকে অনাহত স্বরে উত্থিত হয়, তেমনি ভ্রুমধ্যস্থ আজ্ঞা চক্র হতে সোম মন্ডল থেকে সুক্ষা তৈজস সূর্য্য মন্ডলও অগ্নি মন্ডলে প্রকাশ পায় । এই বাকের চারপাদ । তার তিনটি হল চিৎধর্মী ও গুহাহিত (পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা) — যা প্রকাশ পায় না । কেবল চতুর্থ পাদ দিয়ে মানুষ বলে পারে বা communicate করতে পারে । তাই এ হল বৈখরী বা যে শব্দ খর, অর্থ হচ্ছে যা স্পষ্ট ভাবে কানে আসে । এই বলা বা কারুর নাম ধরে ডাকা এসব আসছে ব্যবহারের তাগিদে । আর সেই ব্যবহারের ভাষা দিয়েই আমরা অপ্রকাশ অনুভবকে ব্যাখ্যা করি, abstract কে concrete ভাষা দিয়ে । কিছু abstract term আমরা সৃষ্টি করেছি যেমন God, Love, being বা ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা ইত্যাদি ভাব — রূপ ধরে — এটাই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম । এই চিন্তার প্রকাশের ইচ্ছাকে দিই আমরা বিভিন্ন নামরূপ । যেমন আমার এই মুহূর্তের অনুভব — 'আমটা কী মিষ্টি !'

এখানে আমার কণ্ঠের মিষ্টত্ব আর আমের মিষ্টত্ব কি এক ? 'মিষ্টি' শব্দটাই আমার অনুভবের একটা symbol । শেষ পর্যন্ত সবটাই অনির্বচনীয় — দুই অর্থেই, ভেঙে বলা যায় না, কিন্তু কী অপরূপ । এই শব্দ উঠছে দেহের মধ্যকার পঞ্চভূত ধারক (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) প্রাণশক্তির বল, দেহের মধ্যস্থ সুক্ষাতন্মাত্র ধারক (রূপ, রস, স্পর্শ, বর্ণ, গন্ধ) মনোবর্গের বল এবং নিজের প্রকৃতিগত আত্মার সর্বব্যাপী ইচ্ছাশক্তির বল থেকে । অতিক্ষুদ্র শব্দ কণিকা রূপে বিশ্বব্যাপী বায়বীয় আকাশে মিলিয়ে যায় তা শব্দ তরঙ্গ রূপে । বিরাট স্থূল বিশ্ব এইভাবে বৈখরী বাককে অবলম্বন করে আছে । আর শব্দে যখন শক্তি আছে, আমার কথা জীবন্ত হয়ে তোমার সেতারে যখন ঝঙ্কার তোলে, তখন তা হয়েও ওঠে মন্ত্র । তবে সব কথাই মন্ত্র নয়, সবার কাছেও নয় । শব্দের এই প্রকাশ ও তার প্রভাবের মধ্যে বাধাটুকু ততদিন থাকবে, যতদিন না আমরা উন্নীত হই বাকি গুহাহিত পাদগুলোয় (মধ্যমা, পশ্যন্তি) এবং সেগুলিকে জীবনে সহজ কোরে তুলতে পারি গভীর অনুশীলনের মাধ্যমে । সাধারণ ভাবে বলা যায় যে আমাদের কোনো বিষয়ে জ্ঞান হয় ইন্দ্রিয়-

সংযোগ থেকে, পঞ্চতন্মাত্রের সহায়ে পঞ্চস্থূল ভূতের প্রতিভাসে । সেই জ্ঞানের সংস্কার ভাব রূপে চিত্তে থাকে, স্মৃতির সহায়ে তা উদ্বুদ্ধ হয় । অধিকাংশ ভাব এই ভাবে ইন্দ্রিয় বোধের সাথে যুক্ত ।

এছাড়া অতীন্দ্রিয় বোধ হওয়াও সম্ভব । কোনো একটা তত্ত্ব বা তথ্য কোনো যুক্তি-তর্কের সহায়তা ছাড়া বিদ্যুৎ চমকের মত কখনো কখনো ঝলক দেয় শুদ্ধসত্ত চিত্তে ।

এই চিত্তবৃত্তি হল প্রতিভার মূল, যা যোগানুশীলনের সাহায্যে বাড়ানো যায় । যেমন, মেয়েটি সহসা বলল — 'কাল আমার দাদা আসবে ।' আর দাদাও এসে গেল ।

আসলে দাদার আসাটা মেয়েটির চিত্তে সহসা প্রতিভাত হয়েছে । ঋষিরা দেখে ছিলেন মানুষের অন্তর্জগতের সাথে বহির্জগতের এক অবাধ সম্পর্ক আছে । যখন অহন্তার কুন্ডলী থেকে বেরিয়ে এসে জগতকে আপন করে নেওয়া যায় খুব দরদী গভীর জীবনবোধ দিয়ে, প্রাণের সাথে প্রাণ মেশানো যায়, তখন সৃষ্টি হয় লোকোত্তর থেকে লৌকিক চেতনার প্রগতি ভাষার অনুভবে । এখানে একটা বিষয় আমাদের সাধারণ ভাবে বুঝতে হবে । বেদে বর্ণ থেকে ভাষার এই যে প্রকাশ ছিল বৈখরীবাকে, এর একটা সমস্যা হল যিনি যে সত্য উপলব্ধি করে ভাষায় তা প্রকাশ করেছেন, যুক্ত অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুখে বা লিখে প্রকাশ কালে নিজ নিজ সংস্কারও বুদ্ধি শক্তির সাধ্য অনুযায়ী তা ব্যাখ্যা করেছেন । তাই একই সত্য উপলব্ধিতে অভেদ থাকলেও বর্ণনা প্রসঙ্গে ভেদ এসে পড়ে, তা আবার মুখে মুখে জনে জনে আরো ভিন্নতা পায় । এটাই ভাষার সীমাবদ্ধতা । তাই বৈদিক সাম - ব্রাহ্মণেরা ভাষা অনুভব করতেন শ্রুতি ও স্মৃতির সময়ে শুধু কান দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে । তাঁরা তাই মন্ত্র চৈতন্যে সামগানে তা ধরে রেখেছিলেন নিখুঁত একসুর, ধ্বনি, ছন্দের মাত্রায় অবিকৃত ভাবে শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে হাজার বছর ধরে অব্যাকৃত ভাবে । যেন চৈতন্যের আবেশে আপনা হতেই মন্ত্রের ধারা স্ফূরণ হতে থাকে, অন্তরে জাগে ভাবের হিল্লোল ।

'শিশু যেমন মা-কে নামের নেশায় ডাকে ।' নেশা না হওয় পর্যন্ত সেই উচ্চারণ কণ্ঠস্থ মাত্র, আত্মস্থ নয় । ধ্বনির এই বৈজ্ঞানিক বাঁধন ঋষিরা জানতেন এবং বেদকে এভাবে কাব্যিক মন্ত্রের সুরে বেঁধেছিলেন । সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের মধ্যে পজিটিভ ও নেগেটিভ দিকে তাঁরা পেয়েছিলেন, পুরুষ ও প্রকৃতির স্বরূপ বা principle । তন্ত্রের ষঠযন্ত্রে যেমন ছটি কোণ দেখানো হয় যার তিনটি পুরুষরূপে ঊর্ধ্বমুখী ত্রিকোণ সৃষ্টি করে আর তিনটি প্রকৃতিরূপে তৈরি করে নিম্নমুখী ত্রিকোণ । যেমন সৃষ্টির পুরুষ প্রতীকী হলেন ব্রহ্মা এবং প্রকৃতি প্রতীকী হলেন সরস্বতী, স্থিতির পুরুষ প্রতীকী বিষ্ণু এবং প্রকৃতি প্রতীকী লক্ষ্মী আর বিনাশের পুরুষ প্রতীকী ও প্রকৃতি প্রতীকী যথাক্রমে মহেশ্বরও মহাকালী । এইভাবে ষঠ কোণ বা তারার মত এই চক্র তৈরি হয়েছে । এই পুরুষ হল শক্তির static অবস্থা আর প্রকৃতি হল dynamic অবস্থা বা মাতৃশক্তি । এই পুরো জগৎটা একটা cosmic dance — এর তরঙ্গে প্রকাশিত আর যত রকম প্রকাশের কলা আছে তা ধ্বনি, ভাষা, সুর, তার, গান, আবৃত্তি, অভিনয়, নৃত্য, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদির সাহায্যে ধরে রেখেছে । এইভাবে যাবতীয় ভাব প্রকাশ পাচ্ছে, রসায়িত হচ্ছে শব্দবাহী ভাষার স্বরে ও নিঃশব্দে দর্শনের রূপের সমন্বয়ে ।

এখন আবার শব্দের ব্যবহারিক বিজ্ঞানেও বিচারে ফিরে আসি । আধ্যাত্মিক ঋষি চেতনার কথায় পরে আসব, প্রথমে নৈসর্গিক ধ্বনিজাত ভাষা সৃষ্টির বিজ্ঞানটা আলোচনা করা যাক । কবি ভরত চন্দ্র দেখিয়েছেন কিভাবে আমাদের সাধারণের অনুভবে নৈসর্গিক ধ্বনি থেকে ভাষা সৃষ্ট হয় । অন্নদামঙ্গলে 'দলম্মল দলম্মল গলে মুন্ডমালা' এই জাতীয় ধ্বন্যাত্মক শব্দ থেকে অনেক ভাষার বোধ অনুভূত হয় । যেমন কা কা করে ডাকে বলে কাক নামকরণ আর কুহু কুহু করে ডাকে বলে কোকিল বা মানুষ খুক খুক করে কাশে, আর হাহা করে হাসে এগুলো সব নৈসর্গিক ধ্বনির অনুকরণ । আবার অন্যদিকে কিছু ধ্বন্যাত্মক শব্দের কোনো অর্থ পাওয়া যায় না যদিও তা আশ্চর্যভাবে হৃদয়ে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে । যেমন চকচকে কয়েন বললে ঔজ্জ্বল্য ঠিকরে পড়ে, আবার টুকটুকে লাল বললে রাঙার তীক্ষ্ণতা ফুটে ওঠে, যদিও এদের মধ্যে কোনো ধ্বনি শ্রুত হয় না । তাই এগুলি নৈসর্গিক ধ্বনি জাত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার আগে শব্দ — সৃষ্টির মৌলিক উপাদানও গঠনের কাঠামো সম্বন্ধে কিছু সাধারণ জ্ঞানের আলোচনা দরকার । যেমন বাঁশীতে মূলছিদ্র ছাড়া আরো সাতটি ছিদ্র আছে । মূলছিদ্রে ফুঁ দিলে ফাঁপা নলের মধ্যে দিয়ে যে হাওয়াটা শব্দ তরঙ্গ তোলে তাতে আমাদের

মিষ্টত্ব লাগে এবং তা কোনো ভাবে আঘাত বাধা প্রাপ্ত হয় না বলে এ হল অনাহত ধ্বনি। এরপর বিভিন্ন ছিদ্রে আঙুল দিয়ে বাধা সৃষ্টি করে আমরা সাতটা সুর তুলি, সেই আহত বায়ুরাশির নানা ঢেউ কানে এসে স্নায়ুতন্ত্রে আঘাত দিয়ে নানা মধুর ধ্বনির বোধ তোলে। এই ঢেউগুলি সংখ্যায় খুব কম হলে কানে ধ্বনি জ্ঞান হয় না, আবার লাখ খানেক বা আরো বেশী হলেও কোনো ধ্বনিজ্ঞান জন্মেনা। দুশো, পাঁচশো বা দুদশ হাজার হলে ধ্বনিজ্ঞান জন্মায়। প্রতিসেকেন্ডে এই আঘাতের সংখ্যা যত বেশী হয় ধ্বনি তত উঁচুতে ওঠে বা কড়িতে ওঠে, আর সংখ্যায় যত কমে ততই কোমল হয়। তেমনি তানপুরার ক্ষেত্রেও একইভাবে ধ্বনির ঢেউ সৃষ্টি করে। তানপুরার তার যত লম্বা ধ্বনি তত কোমল, আর যত ছোট ধ্বনি তত উঁচু। এগুলি সবই মধুর ধ্বনি। তীব্রও মধুর মিশিয়ে ধ্বনির প্রকৃতি ও মাধুর্য বদলে দেওয়া যায়। আবার কাঠের টেবিলে ঠক ঠক করে ঠোকর দিলে কাঠের অংশটায় যে কম্পন হয় তা সারা কাঠের ফলকে বাঁশীর মত সমান ভাগে তরঙ্গ সুষৌম্যে না প্রকাশ পেয়ে এলোমেলো ও অনিয়তভাবে এক কর্কশ ধ্বনির সৃষ্টি করে। বড় দেওয়াল ঘড়িতে যখন ঢং শব্দে ঘন্টা পড়ে তখন তার 'ঢ' কর্কশ অংশটুকু খুবই ক্ষণিক, পিতলের উপর হাতুড়ির স্পর্শমাত্র হয়েই চলে যায় রেশ থেকে যায় মধুর 'অং' — টুকুর। এখানে ক্ষণস্থায়ী কর্কশ 'ঢ' হল ব্যাঞ্জনবর্ণ, আর স্থায়ী মধুর 'অং' — টুকু স্বরবর্ণ।

আমাদের বাগযন্ত্রটাও অনেকটা কথা বলার সময় বাঁশীর মত কাজ করে। ফুসফুস থেকে বায়ু মুখ কোটর হতে বার হবার সময় কোনো বাধা না পেয়ে অনাহতভাবে স্বরবর্ণের ধ্বনি উৎপন্ন করে, আর কোন স্থানে আঘাত বা আটক পেয়ে ব্যাঞ্জনবর্ণের ধ্বনি সৃষ্টি করে। যেমন, কণ্ঠনালীর বায়ু বার হবার মুখে ক্ষণেকের মত জিহ্বার গোড়া উপরে তুলে যদি কণ্ঠের দ্বার আটকে দি, তখন ধ্বনি বেরোয় 'ক' এবং এ হল জিহ্বামূলীয় স্পর্শ ব্যাঞ্জনবর্ণ। জিহ্বার মধ্যভাগ তালুতে স্পর্শ কোরে বাতাস আটকালে ধ্বনি হল 'চ'-তা লব্য স্পর্শ ব্যাঞ্জন বর্ণ। জিহ্বার ডগা উলটে উপরে তুলে তালুর পিছনে (যেখানটাকে মূর্দ্ধা বলে), সেখানে আটকালে ধ্বনি হল 'ট' — মূর্দ্ধন্য স্পর্শ ব্যঞ্জন বর্ণ। আবার জিহ্বার গোড়াটাকে দাঁতের পাটিতে ঠেকিয়ে বাতাস আটকালে ধ্বনি হয় 'ত' — দন্ত্যস্পর্শ ব্যাঞ্জনবর্ণ। আর দুই ঠোঁট পরস্পর স্পর্শ করে তার মধ্যে দিয়ে জোরে বাতাস ছেড়ে দিলে ধ্বনি জন্মাল 'প'-যা হল ওষ্ঠ্যস্পর্শ ব্যাঞ্জনধ্বনি খুবই ক্ষণস্থায়ী, এর স্থিতি এত অল্প যে আগে বা পরে স্বরধ্বনি না থাকলে এর উচ্চারণ হয় না। এক কথায় হাওয়া এইরূপ বিভিন্ন স্থানে বাধা পেয়ে হয় ব্যঞ্জনধ্বনি, আর বাধা সরে গেলে যা বেরোবে তা স্বরধ্বনি। এবার স্বরের উচ্চারণ বিশ্লেষণে দুই — একটা কথা বলা প্রয়োজন। খাঁটি স্বরের উচ্চারণে মুখ একবারে খোলা থাকে। 'আ' উচ্চারণের ক্ষেত্রে আমরা মুখটা একেবারে ব্যাদান কোরে যতটা সম্ভব হাঁ করে থাকি আর জিহ্বা পুরো হাওয়াটা নির্গমনের জন্য মুখগহ্বরের নীচে সংকুচিত হয়ে থাকে। আবার 'ঈ' উচ্চারণের সময় জিহ্বা উপরে উঠে তালুর কাছে যায় এবং তার সামনের অংশ নীচের দাঁতের পাটির পিছনে চলে আসে। মুখের কোটর অনেক ছোট হয়ে পড়ে। 'ঊ' উচ্চারণের সময় মুখের কোটর আরো ছোট হয়; ঠোঁট দুটো কাছাকাছি চলে আসে, আর ছোট্ট ফাঁকের মধ্য দিয়ে হাওয়া বের হয়। অর্থাৎ মুখের কোটরের আকৃতির ভেদ অনুযায়ী স্বর বর্ণের ভেদ বা বিকার হয়। এইভাবে অ ই উ ইত্যাদি রা ভিন্ন ভিন্ন স্বরের ধ্বনি একই মূলধ্বনির সাথে অন্যান্য উচ্চতর ধ্বনির সংযোগে নানা রূপ বিকার মাত্র।

আর মাত্রা ভেদে এগুলির প্রত্যেকটা হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত এই তিনটে রূপে থাকে। এগুলি সব আমরা বাংলায় সংস্কৃত ভাষা থেকে নিয়েছি। আমরা অ ই উ এদের সন্ধি কোরে সন্ধ্যাক্ষর সৃষ্টি কোরেছি।

অ + ই = এ; অ + উ = ও

অ + এ = ঐ; অ + ও = ঔ

এইভাবে পন্ডিত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ধ্বনি বিচারে সমস্ত ব্যাকরণ গত বর্ণের নিখুঁত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও সম্বন্ধ স্থাপন কোরেছেন তাঁর শব্দ-কথায়। শুধু তাই নয় তিনি এই উচ্চারণ কালে মুখের ব্যাদানের মাপ থেকে দেখিয়েছেন অ ই উ এই তিন স্বরের মধ্যে আ হল সবচেয়ে বড় অর্থেই তার চেয়ে ছোট আর উ আরও ছোট। যেমন বাংলায় টা, টি, টু তিনটি প্রত্যয় আছে, যার মধ্যে একটা বললে বড় জিনিস বুঝায়, একটু বললে আরও ছোট, অতি অল্প বুঝায়। এইরূপে চকচকে বললে উজ্জ্বল জিনিস বোঝায়, চিকচিক-এর ঔজ্জ্বল্য তার চেয়ে কম।

লাঠির আঘাতে যে শব্দ তা কাঠিন্যের 'টক' ধ্বনি। তেমনি তীব্র লোহিত বর্ণ চোখকে যখন আঘাত দেয়, চোখ যেন টকটক করে। তাই রাঙা টকটকে। আবার সেই জ্যোতি একটু কম হলে তা হয় রাঙা টুকটুকে। রাগে তার চোখ রাঙা টকটকে। আবার, রাঙা টুকটুকে বৌ। যা প্রথমে চোখে আঘাত করছিল তা হয়ে উঠল সুন্দর। এই ভাবে গৌর বর্ণ শিশুকে টুকটুকে সুন্দর শিশু বলা হয়। এইভাবে রামেন্দ্র সুন্দর মহাশয় ধ্বনি থেকে বিস্তার করেছেন শব্দও ভাষার অর্থের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ।

এবার ভারতীয় ঋষিদের আধ্যাত্মিক ভাবে ভাষার বিশ্লেষণ সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। আগেই বলা হয়েছে মনের ভাব আদান-প্রদানের জন্য বাককে চার অবস্থায় বিভাগ করা হয়েছে — বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরা। এর মধ্যে বৈখরীর প্রকাশ কণ্ঠে এবং এর সৃষ্টি শরীরস্থ নীচে মূলাধার থেকে অনাহত নাদ ধ্বনিতে। মধ্যমা বাকচিৎ শক্তিযুক্ত এর দৃষ্টি থাকে উর্ধে কারণ ভূমি সহস্রারের দিক থেকে। আমাদের মনের মধ্যে নানা অর্জিত সংস্কারের একটা garbage বা স্তুপ জমে থাকে। সাধারণ অবস্থায় এগুলির জন্য আমরা একলা থাকলে মনে মনে কথা বলি বা অস্পষ্ট চিত্রে ভেসে চলি যে গুলি খুব এলোমেলো বা অসংলগ্ন। ধ্যানের কলায় মনকে এইসব থেকে চিন্তা শূন্য করে মনকে শূন্যতা বা blank অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায়। ঐ ব্ল্যাংক অবস্থা থেকেই ভিতরের চেতনাজাত প্রকৃত জ্ঞান ফুটে ওঠে। মনের হাজার বাসনা, ইচ্ছা, ধারণা ও সংস্কারে ভারাক্রান্ত থাকায় সত্য প্রকাশ হতে পারছে না। মনের একদম শূন্য অবস্থায় প্রকৃত জ্ঞান ফুটতে শুরু করে। ধ্যানের এই অবস্থায় মনের আর অস্তিত্বই থাকে না এবং চেতনাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ অবস্থায় সত্য ভিতর থেকে আপনি বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। এ হল যেন মন্ত্ররূপ বাক যা হৃদয়ে হৃদয়ে বেজে ওঠে, উজ্জ্বল বর্ণময় আলোর অনুভূতি আনে। তাই বৈখরীর থেকে মধ্যমা অনেক বেশী মৌলিক। পরের বাক গুলি সুক্ষ্মতম চৈতন্য মিশ্রিত অনুভূতি আনে। এখানে ভাবের আদান প্রদানকে কেউ কোনো কথা বলেন না বা গুরু শিষ্য কে লেকচার দেন না, কোনো ভাষণ বা বক্তৃতা হয় না। গুরুও উপস্থিত সকলে চুপচাপ থাকেন এবং শিষ্যের মধ্যে তাৎক্ষণিক জিজ্ঞাসা উঠলে গুরু সেই স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী উত্তর দিতে আরম্ভ করেন। এ যেন ঠিক কণা বা পার্টিকেলের নাচের মত কখনো তা স্থির (static) কখনো তরঙ্গায়িত (wave)। নীরবতা ভেদ করে শিষ্যের মধ্যে জিজ্ঞাসা উঠে এল আর তার সাথে সঙ্গতি রেখে গুরুর মীমাংসা উঠল wave complete করতে গীতা মাত্র কয়েক মিনিটে শ্রীকৃষ্ণ সবটা বলেছিলেন অর্জুনকে যা আমাদের দেড় ঘন্টাধিক সময় লাগে শেষ করতে। বিশ্বরূপ দর্শনও এই রূপ এক সৃষ্টি তত্ত্বের প্রকাশ। জগতের সব কিছুই তিনি করে রেখেছেন। দেখালেন কিভাবে তা তাঁর থেকে জাত হয়ে তাঁর মধ্যেই লয় হচ্ছে। এখানে বাক দ্বৈত সত্তায় থাকলেও তা চৈতন্যে সমাহিত; সহস্রার থেকে মূলাধার পর্যন্ত বিধৃত ও বিশ্রামপ্রাপ্ত। এই তিন বাকের জন্মস্থান হল শিরসহস্রারের নানা স্তরে। মন্ত্ররূপ মধ্যমা সহস্রার থেকে হৃদ কেন্দ্র পর্য্যন্ত, যেখানে ধ্যেয় বস্তুর সাথে রূপ রসাদির চৈতন্যময় অনুভূতি হয়। পশ্যন্তীর বিস্তারনাভি (মনিপুর) পর্য্যন্ত যেখানে ধ্যেয় বস্তু তৈজস রূপে অনুভূতি গম্য। আর পরাবাক জীবাধার কুল কুন্ডলিনী, অতিসুক্ষা ধ্যানরত। যাইহোক অব্যক্ত নিত্য অক্ষর চিন্ময় পরাবাক এবং দিব্যপশ্যন্তীবাক হয়ে মন্ত্রময় মধ্যমা বাকে মনোময় সুক্ষা বাকে এবং শেষে স্থূল বৈখরী বাকে স্থূল বিশ্ব, স্থূল প্রপঞ্চ ও স্থূল দেহ ব্যাপী। এসব নিয়েই শব্দব্রহ্ম।

ঋষিরা বর্ণ মাতৃকাকে ভ্রুমধ্য আজ্ঞা চক্র থেকে মাত্রায় এনেছেন প্রথমে ১৬ টি স্বরবর্ণে যা সোম মন্ডল নামে আছে। এরপর ক থেকে ম পর্য্যন্ত ব্যাঞ্জন ধ্বনি হল সূর্য্যমন্ডল, আর, য থেকে ক্ষ পর্য্যন্ত হল অগ্নিমন্ডল। এগুলো সব সাধন লব্ধ অনুভূত জ্ঞান। এবং এর বিশদ ব্যাখ্যা বেদে পাওয়া যায় যা ৪৯ টা বর্ণকে আলোক রশ্মি কণা হিসাবে শরীরের বিভিন্ন চক্র স্থানে — আত্মকলা, প্রকৃতি — পুরুষের মন কলা, আগ্নেয়, শূন্য বা আকাশস্থান, প্রাণ বা বায়ুস্থান, তেজস্থান, অপস্থান, ভূমিস্থান ও ওজঃবাহক উষ্মস্থান দিয়ে চিহ্নিত হয়েছে।

এতকিছু অবতারণা করার অর্থ হল এই ন্যাস যুক্ত বর্ণ থেকে বৈখরীতে মন্ত্র ও সুরসমন্বিত যে বিশুদ্ধ আদিভাষা সৃষ্টি হয়েছিল ঋষি চেতনায় বেদে অন্তত পনেরো থেকে কুড়ি হাজার বছর আগে এমন সব সুর, স্বর ও ধ্বনিতে কাব্যিক সুষমায় তা যুগের বিবর্তনে নানাভাবে, নানাসুরে, নানাবিদেশী শব্দের মিশ্রতায় মিষ্টত্বর সুর হারিয়েও শরীরকে বিশেষভাবে উজ্জীবিত না কোরে, আর

বেদনা থেকে ক্রমে ক্রমে সাধারণ মানুষের ক্ষেদ হয়ে উঠেছে।

প্রাচীন বাংলা ভাষা এক সময় চর্যাপদাবলীতে আনুমানিক দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে পাই । এই চর্যাগীতি অভিজাত সমাজের আড়ালে বাউল গানের মধ্য দিয়ে আজ পর্য্যন্ত বর্তমান। এরপর দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে আর একধারা প্রভাব বিস্তার করে বৈষ্ণব পদাবলীর মাধ্যমে। জয়দেবের গীতগোবিন্দকে এই ভাষার আদি কাব্য বলা হয় । এখানে সংস্কৃত প্রায়ই যুক্তাক্ষর বর্জিত, অন্বয় খুবই সরল, বিভক্তির জটিল তানেই, সমাসবদ্ধ পদ গুলি বিভক্তিহীন বাংলায় সহজবোধ্য । ভাষা এখানে প্রাকৃতের কাছাকাছি চলে এসেছে । ছন্দও এখানে অপভ্রংশের ছন্দ । যেমন, সংস্কৃত থেকে বাংলা করলে ধ্বনি বৈচিত্রকে আধুনিক মাত্রায় দেওয়া যায় এইরূপে –

'তোমারেই দিশি দিশি হেরিছে যে কৃষ্ণ –

অধরের মধু পানে সতত সতৃষ্ণ। '

বৈষ্ণব সাহিত্যে ভাষা রূপ পায় নিজের প্রাণের ভাষায় সহজ করে গভীর বেদনার প্রকাশে । জয়দেব, বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, রামানন্দ এঁরা সহজমতের ধারা এনেছেন । রবিঠাকুরের ভাষায় যেন – 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়ে রে দেবতা।'

এখানে একদিকে যেমন শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে ঐশ্বর্য আছে, তেমনি আছে দ্বিভুজ মুরলীধর মাধুর্য মূর্তি যা ভাগবতে পাই আবার মহাপ্রভুর প্রেরণায় রূপ – সনাতন – জীবের মধ্যে পাই । এখানে যেন মানুষের হৃদয়ের একটা দ্বার খুলে গেল। বাঙালি যেন ভাষাকে নতুন করে পেল। কাব্যে, সংগীতে কয়েকশ বছর ধরে চলল তার আরতি । আজও তা শেষ হয়নি । ভাষায় ভারতীর বর পুত্র রবিঠাকুরের সৃষ্টি হল সবচেয়ে বিস্ময়কর।

তাঁর ভাষাই যেন আমাদের মাতৃভাষা । এমন নাড়ীর যোগ আর যেন কোথাও আমরা পাইনা । বাংলা ভাষার ভিত গড়ে উঠেছে তাঁর জীবন ব্যাপী সৃষ্টিতে । তাঁর সাধনা ছিল বৈদিক ঋষিদের সাধনার রস গোত্র । তাঁর ভাষা তাই এত আনন্দবাদী । নেতির মধ্য দিয়েও তাইতি বা প্রেমের ভাষায় মহৎ সৃষ্টি হয়ে উঠেছে । বেদে যেমন ঋষি আর কবিতে কোনো তফাত নেই রবি ঠাকুরের অনুভব লব্ধ ভাষা তেমনি সত্যকে প্রকাশ করেছে অনুপম কাব্যে । শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঋষি অরবিন্দ এই যুগের আকাশে এই চার মহাসূর্যের দাক্ষিণ্য আমাদের ভাষা বোধকে করেছে চির উজ্জ্বল।

বর্তমানে এঁদের উত্তুঙ্গ আদর্শবাদকে এড়িয়ে আধুনিকেরা এক ভঙ্গুর ও খিচুড়ি – পথ নিয়েছেন । আমরা পাশ্চাত্য প্রভাবে ঐতিহ্য – ভ্রষ্ট হয়ে পড়ছি অথচ পাশ্চাত্যের বলিষ্ঠতাকেও গ্রহণ করতে পারছি না। প্রাণের বীর্য, ঔদার্য আর মাধুরী আজ বন্ধ্যাত্বে পর্যবসিত হতে চলেছে।

এর সাথে বর্তমানে যুক্ত হয়েছে টেকনোলজির উদ্ভাবিত কম্পিউটারের ভাষা । এপ্রসঙ্গে আহার্য্য সৌমেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীজীর একটি উদ্বৃতি দিয়ে আজকের আলোচনা শেষ করছি –

''আজকের cyber space-এর যুগে পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে এক দ্বৈত মানসিকতা (binary mindset) । এই মানসিকতায় আমরা পৃথিবীকে দেখি হয় ০ অথবা ১ রূপে, হয় কালো অথবা সাদা, ধনী-গরীব, লাভ-লোকসান, হয় আমি নয় তুমি ইত্যাদি । কিন্তু মানুষের অন্তর ও বাহির পূর্ণ করে যে 'সত্যং জ্ঞানম অনন্তংব্রহ্ম' রয়েছেন তাঁকে কিছুতেই এই দ্বৈত কাঠামোতে খাপ খাওয়ানো যায় না । জোর জবরদস্তি করলে মানুষের চেতনা প্রথমে প্রতিবাদ করবে, যার প্রকাশ হয় হিংসায় । আজকের পৃথিবীর সার্বজনীন ভাষা হিংসার ভাষা (language of violence) । মানুষের চেতনাকে উঠতেই হবে দ্বৈত ভূমির সীমা ছাড়িয়ে অদ্বৈতের অসীম অনন্তের স্তরে । এই উত্তরণে পৃথিবী পাবে এক সার্বজনীন নুতন ভাষা । প্রেমের ভাষা (language of love) অবলম্বন করে মানুষের চেতনা উঠবে দ্বৈতের হিংসা থেকে অদ্বৈতের প্রেমের ভূমিতে।''

ফিরে দেখা, — ২০৫০

মানস ঘোষ

২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২০৫০
সিডনী, অস্ট্রেলিয়া।

মাক্যুয়ারি স্ট্রিটের ওপর নিউ সাউথ ওয়েলস স্টেট লাইব্রেরী। তার পাশেই বাংলা আকাদেমি। ওখানে থেকে বেরিয়ে বেন্ট স্ট্রীট, ফিলিপ স্ট্রিট হয়ে মোড়ের মাথায়, যেখানে ব্রিজ স্ট্রিট এসে মিলেছে, সেখানেই সিডনী মিউজিয়াম। মাত্র সাড়ে চারশো মিটার রাস্তা। ভাষা-শহীদ দিবসের প্রভাতফেরী নিয়ে এটুকু হাঁটতেই লেগে গেল পনেরো মিনিট। আমার মতো আশি পেরোনো মানুষের জন্য থেমে থেমে হাঁটা অবশ্য বেশ সুবিধাজনক হয়েছে। সেখানে শহীদস্তম্ভের নিচে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ভাষা শহীদদের ছবি। সবার মাল্যদানের পরে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত, খান্দেকর আলম একটি সংক্ষিপ্ত অথচ আবেগময় বক্তৃতা দিলেন যা অনেকদিন মনে থাকবে। উনি একজন জনপ্রিয় কবিও বটে। ভাষার ভিত্তিতে জন্ম নেওয়া একটি দেশের রাষ্ট্রদূত হয়েছেন একজন কবি, এর চেয়ে স্বাভাবিক আর কিই বা হতে পারে!

এই ঝিরিঝিরি বৃষ্টির সকালে এত লোক রাস্তার দুধারে অভিনন্দন জানাবার জন্য জড় হবে সেটা শ্রীমন্তও ভাবে নি। শ্রীমন্ত মানে 'আনন্দধারা'র কর্ণধার, যে সংস্থা গত তিপান্ন বছর ধরে প্রবাসে বাংলা ভাষা সাহিত্যচর্চার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। আজ সমস্ত অস্ট্রেলিয়া জুড়ে বাংলা ভাষার বিজয়কেতন দেখতে পাচ্ছি তার জন্য এই আনন্দধারা আর অনুশ্রীদির 'বাতায়ন'-এর অনেক অবদান আছে। ২০১৬ সালে এ দেশের সরকার বাংলাভাষাকে যে স্বীকৃতি দেয় তাতে বিদ্যাক্ষেত্রে বাংলাভাষার চর্চা হয়তো শুরু হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে মেলবন্ধন, ভাষাটাকে জনপ্রিয় করা, লেখায় ও পাঠে উৎসাহ দেওয়ার কাজে এই দুই পত্রিকাগোষ্ঠীর নিরলস প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসনীয়।

হাঁটতে হাঁটতেই শ্রীমন্ত'র সঙ্গে কথা হচ্ছিল। কৌতূহলটা ছিল আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে নিয়ে। শ্রীমন্তদের প্রজন্মের না হয় দেশ থেকেই বাংলা লেখা, পড়া বা সাহিত্য প্রেমের ভিত গড়ে উঠেছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে তার পরের প্রজন্মের মধ্যে কি করে এই উৎসাহটা ছড়িয়ে যেতে পারল ? ওর মতে, ২০১৬ এর সরকারী সিদ্ধান্তটা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। ধীরে ধীরে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে বাংলা বিভাগ খোলা হতে লাগল। শিক্ষক দরকার হল। বাংলাভাষা চর্চার সঙ্গে কেরিয়ার গঠনের একটা যোগসূত্র স্থাপিত হল। আর বাকিটা হয়েছে বাংলা সাহিত্যের প্রচারে এবং খুব পরিকল্পিত ভাবে।

প্রথমে অনুবাদ দিয়ে শুরু। একসময় শীর্ষেন্দু, সুনীল, সত্যজিৎ-এর কিশোর সাহিত্যের অনুবাদ হ্যারি পটার সিরিজের মত জনপ্রিয়তা পায়। 'মনোজদের অদ্ভূত বাড়ি' টানা কয়েকমাস বেস্টসেলার হয়। আরেকটু বড়দের মধ্যেও ছড়িয়ে যায়, রবীন্দ্রনাথের গান, ছোটোগল্প। এইসব অল্পস্বল্প মণিমাণিক্যই বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে কৌতুহলী করে তোলেন নতুন প্রজন্মকে। পায়ে হেঁটে রত্নভান্ডারের খোঁজ পেতে শুরু হয় বাংলা শেখা। সেই শুরু, এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

কথায় কথায় পথ শেষ হয়ে এল। শ্রীমন্ত বলল, দাদা, একটু বিশ্রাম নিয়ে নিন। তারপর আমার একটি ছাত্র যাবে আপনার কাছে।'' নতুন প্রজন্ম ও প্রযুক্তির হাত ধরে বাংলা, — ২০৫০'' — এই শিরোনামে গবেষণাপত্রের কাজ করছে। আপনার থেকে কিছু জানতে পারলে ওর একটু সাহায্য হবে।

২০৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসের শতবর্ষ হবে। বিশ্বজুড়ে সেই শতবর্ষ পালনের জন্য একটি উদযাপন কমিটি গড়া হয়েছে। তার প্রতিনিধি হিসেবেই আমার এবারের এই অস্ট্রেলিয়া সফর। এছাড়া শতবর্ষ উপলক্ষে বাংলাকে ১৯৫২-এর ২১ শে রাষ্ট্রপুঞ্জের সপ্তম দাপ্তরিক ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার কথা চলছে। তার জন্য সইসংগ্রহ সংক্রান্ত কিছু কাজও আছে।

আকাদেমির অতিথিশালাতেই আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে । ফিরে এসে কফির কাপটা সবে হাতে নিয়েছি, এমন সময় দরজায় টোকা । শ্রীমন্ত বলেছিল, একটু রেস্ট নেওয়ার সময় পাবো । এ ছেলেটি দেখছি প্রায় সাথে সাথেই চলে এসেছে । একটু ক্লান্ত লাগলেও ছেলেটিকে দেখে আর কিছু বলতে পারলাম না ।

লম্বা একহারা চেহারা, চোখমুখ বেশ ধারালো । গায়ের রঙে বোঝা যাচ্ছে, বেশিদিন হয়নি ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে এসেছে । মনে হল যেন অনেকদিনের চেনা । কোথায় যেন দেখেছি । সম্ভবত আজকের অনুষ্ঠানেই, কারণ আজ অনেকেই ধুতি পাঞ্জাবী পরে এসেছিলেন । এই যুবকের পরনেও ধুতি ও হাফশার্ট । অনেকটা ষাট সত্তর দশকের বাংলা সিনেমার মত । সব ফ্যাশনই দেখছি ঘুরে ঘুরে আসে তাহলে । ছেলেটির বেশ সংকুচিত হাবভাব । জড়সড় হয়ে বসলো একদিকে ।

ওর গবেষণার বিষয় যেহেতু জানতাম, তাই আমিই শুরু করলাম, দেখো ভাই, — গবেষণা যখন করছ, বাংলা ভাষা — সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে তোমাকে হয়তো নতুন কিছু আমি জানাতে পারব না । আমি কেবল নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে সেই জায়গাটাকে কিছুটা তুলে ধরতে পারব, যার ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি ।

ইন্দো আর্য, মগধী, প্রাকৃত, পূর্বী অপভ্রংশ বা অবহট্ঠ ইত্যাদির পরে বাংলাভাষা প্রায় এগারোশো বছর হতে চলল । প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে খুব ধীরে ধীরে বাংলাভাষার পরিবর্তন হয়েছে । কিন্তু গত শতাব্দীর শেষ দুই দশক থেকে এই শতাব্দীর প্রথম দুইদশক, বাংলাভাষা যে প্রবল সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল, তখনকার নতুন প্রজন্ম কে নিয়ে যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল আবার নতুন প্রযুক্তি আর প্রজন্মের হাত ধরেই যেভাবে সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, তা এককথায় অভূতপূর্ব ।

বাংলাভাষা ভাঙাগড়ার প্রধান উৎস ছিল দুই বাংলা । বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গ । আর গোড়াতেই যদি গলদ থাকে তখন তা খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় । সংকট এল অনেকগুলো পথ ধরে, — বাংলামাধ্যম স্কুলগুলিতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরাজি তুলে দেওয়া হল । সন্তানের কেরিয়ারের কথা ভেবে অভিভাবকরা দৌড়লেন ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে । চাহিদা অনুযায়ী যোগান, একের পর এক ইংরাজি মাধ্যম স্কুল আর তাদের ছাত্রসংখ্যা বাড়তে লাগল । 'সন্তান বাংলা জানে না' বলতে নব্য বাবা মায়েরা শ্লাঘা বোধ করতে লাগলেন ! ''মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ'' স্লোগান মুখ ভেংচিয়ে তাকিয়ে রইল অপরিণামদর্শী নীতি নির্ধারকের দিকে । বাংলাভাষার এক শূন্য প্রজন্মের আশঙ্কার সৃষ্টি হল ।

বেকার সমস্যা ছিল ভয়াবহ । কবিতা লিখে কি পেট ভরবে ? চাকরী পাওয়ার জন্য কারিগরি শিক্ষা চাই । সেই আগ্রহের বুলডোজারে গুঁড়িয়ে গেল ভবিষ্যতের সম্ভাব্য শিল্পী, কবি, গায়করাও, পুরো একটা প্রজন্ম ।

তৃতীয়ত, —

বাংলা সাহিত্যের, বিশেষত কবিতার পাঠক ক্রমাগত কমতে লাগল । কার দোষে বলা মুশকিল । প্রকাশনা বা বিপণনের অপেশাদারিত্ব অথবা কিছু কবি সাহিত্যিকের পান্ডিত্যজনিত উন্নাসিকতা, দুর্বোধ্য হওয়ার ঝোঁক, সাধারণের সঙ্গে সাহিত্যের দূরত্ব ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছিল । কেউ বললেন 'কবিতা সবার জন্য নয়' । বিশুদ্ধবাদীরা গদ্যে নতুন শব্দ শৈলীর দিকে বাঁকা চোখে তাকালেন । ভূত আর গোয়েন্দা গল্পকে সাহিত্যের কৌলীন্য দিতেও কারো কারো ছিল বেশ আপত্তি ।

আত্মমগ্ন হয়ে বলে চলেছিলাম । ছেলেটি বেশ মনোযোগী শ্রোতা । তবে মাঝেমধ্যে প্রশ্ন না করলে একটু খটকা লাগে । মনে হয়, শুনছে তো ?

যেন আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই ছেলেটি বলল,

''তাহলে তো ঘুরে দাঁড়ানোর উপায়গুলোও খুব সহজ হবে না মনে হচ্ছে ?'' — না, তা হয় নি, তবে সংকটের সমাধানের চেয়ে, সেই ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ করা আরো বেশী কঠিন । কারণ কোনোটাই পরিকল্পিত ভাবে একজায়গা থেকে হয় নি ।''

শ্রোতার আগ্রহ দেখে ভালো লাগল, আবার বলতে শুরু করলাম, সে সময় অনেক গুলো ব্যাপার একসঙ্গে ঘটল । সমস্যার স্বরূপটা মাথায় থাকলে ঘটনাগুলোর ইতিবাচক দিক একসুত্রে গাঁথতে তোমার অসুবিধা হবে না ।

১৯৯১ এ ভারত অর্থনৈতিক উদারীকরণ আর বিশ্বায়নের পথে পা বাড়ালো । কারিগরিবিদ্যা ছাড়াও নানারকম চাকরীর সুযোগ বাড়তে থাকল । ১৯৯১ থেকে ২০০৪, ইন্টারনেট, বিশ্বায়ন, সোশ্যাল সাইট, অগুনতি টিভি চ্যানেল প্রভৃতির ধাক্কায় যোগাযোগের বিপ্লব ঘটে গেছে । পৃথিবীটা ছোট হতে নব্য প্রজন্ম, বাংলা প্রায় না জানা ছেলেমেয়েরা সারা বিশ্বের সাহিত্য গান কবিতার আলোয় আলোকিত হচ্ছে । স্কুল কলেজের প্রবাসী এবং উচ্চ প্রতিষ্ঠিত সিনিয়রদের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে । তাদের বাংলাভাষা সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ দেখে, বিশ্বসাহিত্যের আলোয় বাংলার ঐশ্বর্য দেখে . . . তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ফিরে আসছে 'আমড়াতলার মোড়ে', হয়ে উঠছে বাংলা সাহিত্যের আগ্রহী পাঠক ।

১৯৯০ এর পরে দেখা গেল পল্লব, অনিন্দ্যর মতো অনেক উজ্জ্বল কেরিয়ার ছেড়ে দিয়ে বাংলা গান, সাহিত্য নিয়ে কাজ করতে শুরু করল । তাদের কাজ জনপ্রিয় হল পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ।

সাধারণের কাছে পৌঁছবার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হল গান আর সিনেমা । সে ক্ষেত্রে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল ওইসময় । ভালো সাহিত্য নিয়ে সিনেমা করা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । ঋতুপর্ণ'র আবির্ভাব ঘটল । তারপর কৌশিক, সৃজিত, অনিরুদ্ধ আরো কিছু বেশ ভালো পরিচালক এলেন, ভালো গল্প নিয়ে সিনেমা আর কবিতা নিয়ে গান হতে শুরু করল । সিনেমা আর গানের পথ ধরে বহু মানুষ বাংলা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির মূল স্রোতে ফিরে এলেন ।

ওদিকে পাশাপাশি প্রযুক্তির উন্নতি দারুণভাবে সাহায্য করেছে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে । কম্পিউটারে 'আমার বাংলা সফটওয়্যার' এর সাহায্যে সারা বিশ্বজুড়ে প্রচুর বাংলা ওয়েব পত্রিকা বেরোনো শুরু হল । ২০০৩ এর মার্চে বাংলা দেশী যুবক মেহেদী হাসান খান তৈরি করলেন অভ্র সফটওয়্যার । অভ্র'র সাহায্যে মোবাইলেও বাংলা লেখা খুব সহজ হয়ে গেল । ফেসবুকে, মেসেঞ্জারে বাংলায় মনের কথা প্রকাশ করার এই সুযোগ আমজনতার কাছে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল । সেসময় সোশ্যাল সাইটে আমার অনেক পরিচিত, যারা আগে সবসময় ইংরাজিতে লিখত, তাদেরও দেখেছি মাতৃভাষায় ফিরে আসতে । আরেকটা কথা স্বীকার করতেই হয়, ২১ ফেব্রুয়ারির আবেগকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটাও সহজ হয়েছিল প্রযুক্তির হাত ধরে ।

সে সময়ের অনেক কবি সাহিত্যিক প্রকাশকও প্রাচীনপন্থী ছুৎমার্গ ছেড়ে প্রযুক্তির সাহায্যে পাঠকদের সঙ্গে প্রায় সরাসরি সংযোগস্থাপন করেছিলেন । এতে শুধু তাঁদের জনপ্রিয়তা বেড়েছিল তাই নয়, বাংলাসাহিত্য ও পাঠক সামগ্রিকভাবে উপকৃত হয়েছিল ।

২০১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বিদ্যালয়ে (যে মাধ্যমই হোক) বাংলা পড়ানো বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করা হল । একসঙ্গে অনেক স্কুলে বাংলা শিক্ষকের দরকার হয়ে পড়ল । বাংলা নিয়ে চাকরী জোটানো মুশকিল, এই মিথের অবসান ঘটল ।

২০১৮ এর বইমেলায় দেখা গেল থ্রিলার, গোয়েন্দা কাহিনীর বই প্রচুর বিক্রি । কিনছেন পরের প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা । যারা সে সময় পরবর্তী প্রজন্মের বাংলাচর্চা নিয়ে সন্দিহান ছিলাম, মানুষের এই আগ্রহকে স্বাগত জানালাম । আজ 'দুই বিঘা জমি' পড়তে শুরু করলে কাল সে পাঠকই হয়তো 'অবনী বাড়ি আছো ?' পড়তে চাইবে । মোটের ওপর বলা যায়, ২০২০ সালের কাছ থেকে ভাষা দৌড়ের ব্যাটমটা যখন হাতে পাই তখন আমরা অনেকটাই এগিয়ে থেকে শুরু করেছিলাম ।

তখনই বাংলাদেশ ছাড়াও পৃথিবীর ৩০টি দেশের ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাবিভাগ ছিল । সেটা এই তিরিশ বছরে বেড়ে প্রায় ১৭৮ টা হয়েছে ।

ভারতে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ছাড়াও আসামের তিন জেলা আর কর্ণাটকের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা ছিল বাংলা । এখন এর সঙ্গে যোগ হয়েছে, বিহার, ঝাড়খন্ড আর দিল্লী ।

তবে প্রযুক্তি আর বিজ্ঞান গত তিরিশ বছরে প্রায় হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগোচ্ছে । আগের চল্লিশবছর এত দ্রুততার কথা মাথায় রাখলে এটাই স্বাভাবিক । এরই মধ্যে একটা খুব কাজের জিনিস বার করেছে বাঙ্গালী ছেলে তথাগত । এই শব্দজব্দ মেশিনটা, মুখে 'বলা কথা লেখা' হয়ে যাবে, এবং মানে বুঝে নিয়ে নিজে নিজেই এডিট করে নেবে । গুগল এর কাছাকাছি একটা ব্যাবস্থা অন্য ভাষার জন্য করেছিল বটে, সেটা এত উন্নত ছিল না । বিজ্ঞান

আর প্রযুক্তির আরো একটা অবদান, ডিজিটাল আর্কাইভের ব্যাপক প্রচলন। তাছাড়া ছাপানো বইও আর নষ্ট হয় না। উন্নত কাগজ, উন্নততর রক্ষণাবেক্ষণ এর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

গত তিরিশ বছর নতুন প্রজন্ম সবচেয়ে বড় যে কাজটা করেছে বলে আমার মনে হয়, তা হল বিশুদ্ধবাদীতা বা গোঁড়ামির বিসর্জনকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা। ২০২০ সালে বাংলায় মিশে ছিল, মাগধী, প্রাকৃত, পালি, সংস্কৃত, ফারসি, আরবি আর তার সঙ্গে টেবিল, হাসপাতালের মতো হাতে গোনা কয়েকটি ইংরাজি শব্দ। এখন কিন্তু কথ্যভাষায় স্বাভাবিকভাবে আসা অনেক ইংরাজি শব্দকেই বাংলাভাষা নিজের করে নিয়েছে এবং তাতে ভাষার মাধুর্য বিন্দুমাত্র কমেনি।

আরেকটা বড় কাজ, কারিগরি ও বিজ্ঞানের পরিভাষা তৈরী, আর তার প্রচার। বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার যাবতীয় বই এখন বাংলায় পাওয়া যাচ্ছে।

এই প্রথম মনে হল, ছাত্রটি একটু উশখুশ করছে। বলল,

''একটা কথা বলবার ছিল স্যার . . .''

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

ছেলেটি বলল,

''স্যার, আজকের এই নতুন প্রজন্ম কি পেয়েছে দুই বাংলা ভাগ হওয়ার বেদনার উত্তরাধিকার ? এখন তো মুক্তমনা মানুষের প্রজন্ম। আপনিই তো লিখেছিলেন, বিশ্বজুড়ে অবসান হয়েছে সমস্তরকম ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মৌলবাদের ! এই সময় কি স্বপ্ন দেখা যায় না, দুই জার্মানির মত দুই বাংলাও আবার এক হোক ? এখনকার ছাত্ররা কি ভাবছে জানি না, তবে ১৯৫২ সালে শহীদ হওয়া ছাত্ররাও অনেকে এমন স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসত। যেমন ধরুন, রফিকউদ্দিন আহমেদ ছোটবেলায় মিত্র ইনস্টিটিউশন পড়েছিল, তার বাবাও অনেকদিন কলকাতায় ছিল। ২১ শের লিফলেট গুলো যদি খুঁজে পান দেখবেন, সেগুলো রফিকের বাবার পারিল প্রেস থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ছাপানো হয়েছিল, তাছাড়া রফিকদের পুরো পরিবারের ইতিহাসই দেশের জন্য আত্মত্যাগের ইতিহাস। কলকাতার সঙ্গে ছিল রফিকের আত্মার বন্ধন . . .'' থামাতে হল। না হলে কোথায় গিয়ে শেষ করতো বলা মুশকিল। বললাম, ''এত দ্রুত প্রসঙ্গান্তরে গেলে কি করে হবে ? আমি বুড়ো মানুষ, খেই হারিয়ে ফেলব যে !''

বেশ বিরক্ত লাগছিলো। প্রসঙ্গটাই একদম যেন পালটে গেল। বাংলাদেশে বাড়ী, এ নিয়ে আবেগ থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু সেটা তো পরে বললেও পারতো ! বললাম,

''একটু বসো। এ ব্যাপারে আমার একটা লেখা এবারের 'মাতৃভাষা' পত্রিকায় বেরিয়েছে, সেটা দিচ্ছি, তোমার কাজে লাগবে।'' ভেতরের ঘরে সবে ঢুকেছি পত্রিকাটা নিয়ে যাওয়ার জন্য, ও ঘর থেকে আওয়াজ এল, ''আসছি স্যার, অনেক ধন্যবাদ !''

ভারী অদ্ভুত ছেলে তো ! সত্যিই চলে গেছে দেখছি। ওইটুকু মৃদু ধমকেই কি অভিমান হয়ে গেল নাকি ? না, তেমনভাবে তো কিছু বলিনি। এসব ভাবতে ভাবতেই আবার বেল বাজল। কিছু ফেলে গেছে বোধহয়।

দরজা খুলে দেখি, এক সুবেশ তরুণ, —

'নমস্কার স্যার, আমি আবু তাহের মল্লিক, শ্রীমন্ত স্যারের ছাত্র। আমার গবেষণা পত্রের জন্য আপনার একটু সাহায্য চাই। উনি আজ আপনাকে আমার কথাই বলেছিলেন।

শুনতে শুনতে আমার মুখের কঠিন রেখাগুলো যেন শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ছিলো। কোনো রকমে জিগ্যেস করলাম, আপনিই শ্রীমন্তর ছাত্র, তাহলে উনি কে, আপনার পাশ দিয়ে যে বেরিয়ে গেল ?

আবু বললেন, কাউকে দেখেননি। শরীরের সর্বশক্তি এক করে দ্রুত গেলাম বাইরের লনে। দেখলাম যুবকটি ধীরে ধীরে চলেছে কম্পাউন্ডের গেটের দিকে। অবসন্ন পদক্ষেপ, ধুতি, সাদা হাফশার্ট, শার্টের পিছনদিকটা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে, এতটা দূর থেকেও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি পিঠের মাঝবরাবর একটা গভীর কালো ক্ষত, গুলিটা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গিয়েছিল, ততক্ষণে আমার মনে পড়ে গেছে কেন চেনা লাগছিল ছেলেটিকে,

আজ সকালেই যে ছবি দেখেছি, রফিক, রফিকউদ্দিন আহ্‌মদ।

ওর জামা, সামনের রাস্তা, সমস্ত লনটা যেন রক্তে ভেসে যাচ্ছে ! আর সমস্ত চরাচর জুড়ে যেন বাজছে সেই চেনা গান, আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১ শে ফেব্রুয়ারি . . . . আমি কি ভুলতে পারি ? . . . . আমি কি ভুলতে পারি . . . .

এমন হলে কেমন হবে ?

সিদ্ধার্থ দে

ভাস্বতী নাতি সাগরের সঙ্গে কথা বলছেন হলোফোনে (holophone) । ভাস্বতীর বয়স এখন তিরানব্বই, ডাক্তার নাতিটি বছর তিরিশের ।

সময়টা ২০৫০ । গত তিন দশকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির তাক লাগানো উন্নতির একটি হল এই হলোফোন । একটি portable tripod -এর মাথায় মুঠো সাইজের যন্ত্রটি লাগানো । প্রযুক্তিটিকে একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের জনপ্রিয় ভিডিও কলের পরবর্তী সংস্করণ বলা চলে — তবে বেশ কয়েকটি নতুন ফিচার আছে । পরিস্থিতি বা প্রয়োজন অনুযায়ী আদ্যিকালের টেলিফোনের মতই ব্যবহার করা চলে, ভিডিও কল করা যায়, আবার দুই বা অধিক প্রান্তের কলাররা ইচ্ছা করলে মাথায় হেডফোন সদৃশ একটি বস্তু লাগিয়ে পরস্পরকে তিন ডাইমেশনে দেখতে পারেন । প্রযুক্তির খুঁটিনাটি বিবরণ দিলাম না ।

এখন জুলাই মাস । ভাস্বতী বসে আছেন ক্যানবেরার ভরা শীতে নিজের লাউঞ্জ রুমে । আর কনফারেন্সে যাওয়া সাগর প্যারিসের একটি ক্যাফেতে । ক্যানবেরায় সময় এখন সন্ধ্যা সাতটা — ভরা শীত । প্যারিসে এক ঝলমলে গরমের দিনের সকাল দশটা । এই হলোফোনে আবার প্রেক্ষাপটও চয়ন করা যায় — নাতি ঠাকুমা ভার্চুয়াল রিয়েলিটির জমানায় ক্যাফের টেবিলটায় মুখোমুখি বসে আছেন । ইচ্ছে করলে সাগরও ক্যানবেরার লাউঞ্জরুমে বসতে পারত ।

বাইবেলের সেই গল্পটা বোধহয় অনেকেই শুনেছেন । মানুষের বেয়াড়াপনায় ক্ষিপ্ত হয়ে ঈশ্বর একবার প্রত্যেকের ভাষা বদলে দিয়ে এক অভূতপূর্ব বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলেন । কোন ভিন্নভাষী নতুন দেশে গেলে কয়েক দশক আগে অবধি মানুষকে বিপাকে পড়তে হত । কিন্তু হালে যে কোন ফোনে বা তাৎক্ষণিক অনুবাদ যন্ত্রে অন্য ভাষার সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ হয়ে যায় বক্তার কণ্ঠস্বর simulate করে । বলাই বাহুল্য, এই হলোফোনেও এই ফিচারটি আছে ।

বলে রাখি, সাগরের মা অলিভিয়া সুইডিশ — অস্ট্রেলিয়াজাত ইঞ্জিনিয়ার বাবা সুমনের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রেমিকা । ভাস্বতী নাতিকে বাংলা অক্ষরজ্ঞান করিয়েছিলেন কচি বয়সে, রবীন্দ্র সঙ্গীতও বেশ কয়েকটি শিখিয়েছিলেন, কিন্তু একটু বড় হতেই সে ইংরেজীকেই নিজের ভাষা হিসেবে বেছে নেয় । তবে এই তাৎক্ষণিক অনুবাদের সুবাদে ঠাকুমার সঙ্গে দূরভাষে কথোপকথনে আর কোন আড় নেই । ভাস্বতী বলেন বাংলায়, সাগর শোনে ইংরেজীতে ঠাকুরমারই গলার স্বরে । আর ভাস্বতী শোনেন বাংলায় । মাত্র কুড়ি বছর আগেও এই তাৎক্ষণিক অনুবাদ রীতিমত হাস্যকর রূপ নিত — কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ফলে দৈনন্দিন কথাবার্তা তো বটেই, কবিতা বা গান অবধি অপূর্ব ভাবে অনুদিত হয়ে যাচ্ছে হালে ।

প্রেক্ষাপট সেরে এবার ঠাকুমা নাতির কথোপকথনের কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি :

ভা : হ্যাঁরে, মেঘে মেঘে বেলা তো হল । ডাক্তারি করেই কি জীবনটা কাটাবি ? বিয়ে-থার কথা ভাবছিস কিছু ।

স : (হেসে) হুম । বিয়ে করব না তা তো বলিনি, কিন্তু মনের মত পাত্রী পেলাম কই ?

ভা : বাজে কথা বলিস না - এতগুলো ছুঁড়ির সঙ্গে তো মেলামেশা করলি দেখলুম । আর কি করেছিস সেটা নাহয় নাই বললাম । একটাকেও মনে ধরল না ? সেই বটসোয়ানার শ্যামাঙ্গিনী মেয়েটি, জুলি না কি যেন নাম, তাকে তো খুবই শ্রীময়ী লেগেছিল আমার . . .

সা : সত্যি করে বলতো ঠাম্মা, ওদের একটাও কি আমার ঠাম্মার মত সুন্দরী ?

ভা : ইয়ার্কি হচ্ছে বুড়ি ঠাম্মার সঙ্গে . . . .

সা : না না ঠাট্টা করছি না, তোমার পঞ্চাশ বছরের ছবিতেও যা রূপ, যা চটক দেখেছি, এদের কারোর মধ্যে তা খুঁজে পাইনি ।

ভা : আরে বাবা, রূপ দিয়ে কি ধুয়ে খাবি । দেখ না, আমি এমনই মুখ্য যে আজ ষাট বছর এই অস্ট্রেলিয়াতে থেকেও ঠিকমত ইংরিজি উচ্চারণ করতে পারি না, ভুলভাল শব্দ ব্যবহার করি ।

সা : সে সমস্যা আমার জন্মের আগে ছিল । এখন কি এসে যাচ্ছে ? এই তো তুমি-আমি দিব্যি কথা চালাই । আর তুমি তো দেখি সেদিন টমাস হার্ডির একটা প্রেমের উপন্যাসের real time বাংলা অনুবাদ গোগ্রাসে গিলছিলে আর ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদছিলে আবার . . . .

ভ : তা ঠিক, তবে প্রেক্ষাপট বুঝতে কিছু অসুবিধে তো এখনও হয় । আর নাতির সঙ্গে কি আর সব সময়ে হলোফোনে কথা বলতে ভাল লাগে ? ঐ ছাতার যন্ত্রটা ছাড়া তুই ভাঙা বাঙলা বলবি, নয়তো আমি কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে ইংরিজি বলব ।

স : হ্যাঁ প্রেক্ষাপট বা কোন গভীর দর্শন বুঝতে অসুবিধে হয় বৈকি । তবে জান ঠাম্মা, ভাষা হল মনের ভাবের আদানপ্রদান । কোন সিরিয়াস লেখারই ১০০ শতাংশ কি বুঝতে পারি আমরা ? সে চেষ্টা করা বৃথা । যেমন তোমার রবি ঠাকুরের প্রবন্ধ বা গল্পগুচ্ছ পড়তে বেশ লাগে, কিন্তু যেই ভদ্রলোক গম্ভীর আলোচনায় বা দর্শনে ঢুকে পড়েন অনেক কিছুই বুঝি না প্রেক্ষাপট বা বিষয়বস্তু না জানার কারণে . . . .

ভা : তবে লেখকের বা প্রবন্ধকারের অন্য ভাষায় লেখা বক্তব্যটা নিজের ভাষায় বুঝে নেওয়াই তো একটা বড় পাওনা, তাই না ? আর যদি সুনীল, শীর্ষেন্দু, সমরেশ বা পরবর্তীকালের কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রচেত গুপ্তর লেখা পড়িস নাহলে বাঙলার মানুষ, সমাজ, পরিবেশ সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারবি । নিদেনপক্ষে লেখার মূলস্রোতটা ধরতে পারবি ।

সা : আমি কিন্তু এঁদের প্রত্যেকের লেখাই পড়েছি ।

ভা : তাই নাকি ! কবে থেকে তোর বাংলা ভাষায় এত উৎসাহ হল রে ?

সা : (মুচকি হেসে) ক্রমশ প্রকাশ্য । ঐ যে তুমি বিয়ের কথা বলছিলে না ! বাঙালি মেয়ে ছাড়া আমার ঠাম্মার মত সুন্দরী পাব কোথায় ?

ভা : তবে রে ছোঁড়া, তুই ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিলি ! তা কে সেই সুন্দরী ?

সা : একটু দাঁড়াও ।

(সাগর হলোফোনের উদ্দেশ্যে বলল 'কল মৈত্রেয়ী' । কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এক সপ্রতিভ তরুণী ক্যাফের টেবিলের আর একটি চেয়ারে এসে বসল । ভাস্বতী অবাক চোখে বললেন ''বাহ !'')

মৈত্রেয়ী : শুভ সন্ধ্যা, ঠাম্মা ।

সা : মৈত্রেয়ী ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপিকা । দাদুর কলকাতার বন্ধু জগদীশ সেনের নাতনি । ওর আমাকে accept করার প্রধান শর্ত ছিল আমাকে দারুণভাবে বাংলা শিখতে হবে ।

ভা : আমার ভাবী নাতবৌটিকে জিজ্ঞেস করব, শিখেছে কি কিছু ?

মৈ : সাগর, অনুবাদ ফিচারটা বন্ধ করে দাও তো !

(সাগর হলোফোনটিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল । এর পরের কথোপকথন ৯০ শতাংশ বাংলায় । উচ্চারণে টান অবশ্যই আছে কিছুটা, কিন্তু সাগরের ভাষার ওপর নবলব্ধ দখল বিস্ময়কর ।)

মৈ : ঠাম্মা আর একটা খবর দেব । চেয়ার থেকে পড়ে যাবেন না যেন । সাগরের একটি কাব্যগ্রন্থ কলকাতায় আলোড়ন তুলেছে ।

ভা : (বিস্ফোরিত চোখে) তাই নাকি ?

মৈ : একদম । উৎসর্গ করেছে ওর ঠাকুরমা ভাস্বতী দত্তকে । নাম ''তৃতীয় প্রজন্মের কবিতা''।

ভাস্বতীর শীর্ণ গাল বেয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু নেমে এলো ।

বাংলা ভাষা ২০৫০ — নবীন প্রজন্ম ও নতুন প্রযুক্তির হাত ধরে

শাশ্বতী বসু

বাংলা ভাষা বর্তমান প্রজন্মের তথ্য প্রযুক্তি সমৃধ্য হাতটি ধরে আজ থেকে তিন দশক পরে কি চেহারা নেবে, তার ভবিষ্যতে আরো উজ্জ্বল হবে না আরও সংকট পূর্ণ হবে সে সম্পর্কে কোনো বক্তব্য রাখা আমার মতো অ-ভাষাবিদের পক্ষে অনাধিকার চর্চারই নামান্তর । তবু যে কিছু বলতে বসেছি তার কারণ হয়ত এ ভাষার প্রতি আমাদের ভালবাসা । ভালবাসা সঞ্চারিত করে এক অধিকার বোধ । সেই অধিকার বোধ থেকেই এই বলার ইচ্ছেটি অনুভূত ।

কেমন হবে আমাদের ভালবাসার ভাষাটি কয়েক দশক পরে সে কথা মনে হলেই মনে হয় — কেমন ছিল এ ভাষাটি একদা আর আজই বা কেমন হয়েছে । একদা বাঙালির গৌরব ছিল তার ভাষাটি । ভাষাটি ছিল স্বর্ণ প্রসবিনী । জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে তখন পুরস্কৃত হচ্ছে বাংলার সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক ও চলচিত্র । আমরা বাঙালি হিসেবে ছিলাম গরবী । কিন্তু কালের নিয়ম অবধারিত — যেখানে অর্থনীতি তৈরি করে সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতি তৈরি করে ভাষা । সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক কাঠামোটির দুর্বলতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতি এবং ভাষাটিতে যে চোরাবালিতে ধসে পরার টান অনুভব করছে সেটা স্বীকার না করে উপায় নেই ।

ভাষার বিকাশ আর অস্তিত্ব নির্ভর করে তার ব্যবহারের উপর — কথ্য ভাষায়, লেখায় এবং পড়ায় । শেষ দুটি বিষয় বাদই দিলাম । আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কথ্য ভাষায় যে বাংলা ভাষার ব্যবহারে অন্য ভাষার বাড়াবাড়ি রকমের আধিপত্য সেটা নজরে পড়ে । নজড়ে পড়ে আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদে, খাওয়া-দাওয়ায় ধনী সংস্কৃতির অনুকরণ — এখানেই চোরাবালির টান অনুভব করি, যখন দেখি জাতীয় স্তরে বহু দিন কোনো বাংলা সাহিত্যের স্বীকৃতি নেই । দেশ পত্রিকা যখন তার বার্ষিক বিতর্ক সভার বিষয়বস্তু হিসেবে 'বাঙালি এখন হিন্দির দাসত্ব করতেই স্বচ্ছন্দ' নামক শিরোনামটি নেন তখন এই চোরাবালি আর অস্পষ্ট থাকে না — স্পষ্ট হয়ে ওঠে । আমাদের ভাষার অস্তিত্বের সংকট যেন অশনি সংকেত জানান দেয় । এই প্রবণতা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে এই সংকট পরিহার করা কি যাবে ?

হয়ত এতক্ষণে আমার উপর নিরাশাবাদীর তকমাটি এঁটে দেওয়া হয়েছে । কারণ নতুন প্রযুক্তির হাত ধরে সত্যি বাংলা ভাষার পরিসর অনেক বেড়েছে । বিদেশের বেডিও, দূরদর্শনে বাংলা ভাষার কার্যসূচির জন্য অধিক সময় বরাদ্দ হচ্ছে, বিদেশী স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে বাংলা বিষয় হিসাবে নেওয়া যাচ্ছে, মোবাইলে, কম্পুটারে বাংলা লেখা যাচ্ছে, অনলাইনে চটপট কম সময়ে বাংলা শিখে নেওয়া যাচ্ছে, বাংলা পঠন পাঠনে পোস্ট গ্রাজুয়েট স্তরে পড়ানোর পাঠ্যক্রম তৈরির জন্য সিডনিতে বাংলা আকাদেমি রয়েছে বাংলাদেশের । তাছাড়াও রয়েছে ছোটখাট প্রচেষ্টা যেমন রবিবারের বাংলা স্কুল ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । এ সবই তো খুবই সদর্থক দিক বাংলা পরিসরের বিস্তৃতির ভালো উদাহরণ । আসাম যখন বাংলার আধিপত্য ছেড়ে অসমীয়া ভাষাকে অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে নেবার জন্য আন্দোলন শুরু করে তখন রবীন্দ্রনাথের খেদোক্তি শোনা যায় বাংলা ভাষার পরিসর কমে গেল বলে । তিনি থাকলে খুশি হতেন এই দেখে যে — সুদুর মিশর ইসরাইলের সীমান্তবর্তী 'সায়নায়' পেনিন্সুলাতে আমেরিকান ডিফেন্সের একজন ম্যারিন কি অক্লেশে বাংলা বলছে এই নবীন প্রযুক্তির সৌজন্যে ।

কিন্তু এসব প্রচেষ্টার ফলাফল কি ? এই নতুন প্রযুক্তির হাত ধরে একটিও কি দ্বি-ভাষাবিদ (bilingual) তৈরি হচ্ছে যারা বাংলা পড়তে লিখতে ইংরেজির মতই স্বচ্ছন্দ — যারা বাংলা সাহিত্যের মনি মানিক্যের স্বাদ নেবেন ? এ নিয়ে খোঁজ খবর নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে । প্রয়োজন রয়েছে আমাদের নবীন প্রজন্মকে একটু বাঙালি-মনস্ক করে তোলার যাতে বাংলা ভাষার প্রতি তাদের আগ্রহ ও মমত্ববোধের সৃষ্টি হয় ও বাংলাকে কথ্য ভাষা হিসেবে ব্যবহার করতে লজ্জা না পায় । এই নবীন প্রজন্ম যারা দেশে ও বিদেশে শুধু কথ্য ভাষা

ব্যবহার করা ছাড়া বাংলায় লিখতে পড়তে পারে না তারা আমাদের অনুবাদ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে পারে । আমাদের প্রথিতযশা সাহিত্যিকরা যদি নিজেরা কিছু বাংলা সাহিত্যের অডিও রেকর্ড করানোর উদ্যোগ নেন তো ভালো হয় । অডিও মাধ্যমের বইগুলো নবীন প্রজন্মকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে । এ প্রজন্ম তো বিশ্ব সাহিত্যের নাগরিক । নবীন প্রজন্মের দ্বি-ভাষাবিদ যদি বিশ্ব সাহিত্যকে আমাদের নাগালের মধ্যে এনে দিতে পারে তার চেয়ে ভালো পুরস্কার বাংলা ভাষার জন্যে আর কি হতে পারে ? হয়ত এদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলা সাহিত্য লিখবে রোমান হরফে । তৈরি করবে সার্বজনীন গৃহীত romanised বাংলা অক্ষরের ‘বর্ণ পরিচয়’ । দু হাজার পঞ্চাশে সেটা আমরা পাব এই আশাই করি ।

আমার ছেলের বাংলাটা আসেনা

'আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসেনা অথবা বাংলা পরীক্ষাটাও কেন ইংরেজীতে করা হয় না বলে যতই ব্যঙ্গ করা হোক না কেন এটাই কিন্তু বর্তমান সমাজের চিত্রপট।

আর ভাষার বিবর্তনের কথা যদি বলতে হয় তা হলে বলতে হয় বাংলা ভাষার রূপের এতটাই পরিবর্তন হয়েছে যে আগের শব্দরূপগুলিকেও এখন বাংলা শব্দরূপ বলে ভ্রম হয়।

যেমন চর্যাগীতিকার একটি পদের উল্লেখ দিয়ে যদি এখনকার তরুণ প্রজন্মের বাংলা ভাষাভাষীদের জিজ্ঞেস করা হয় 'কা আতরু বর পঞ্চবি ডাল' এর মানে কি ?

তাদের কাছে তা ধাঁধা ছাড়া কিছুই মনে হবে না। অথচ এটাই ছিল একসময়ে বাংলা ভাষার আদিরূপ।

এই ভাষা বর্তমান প্রজন্মের না জানার কারণ হচ্ছে চর্চার অভাব আর সময়ের বিশাল ব্যবধান। এই দুয়ের কারণে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন সময়ে বেনোজলের মতো অজস্র বিদেশি শব্দ ঢুকে পড়েছে।

ভাষা আর মানুষ। একে অপরের সাথে নিবিড় এক বন্ধনে আবদ্ধ। ভাষা হল মায়ের মুখের ভাষা। তাই তো কবি বলেছেন ''বিনা স্বদেশি ভাষা পুরে কি আশা ?'' কবিগুরুর পরামর্শে তাই আমাদের বলতে হয় আগে মাতৃভাষা তার পরে অন্যভাষা। এটা স্মরণে রাখতে হবে।

অথচ বর্তমান প্রজন্মের তরুণদের দিকে তাকালে মনে হয় মাতৃভাষা ছেড়ে কথাবার্তায়, সাজসজ্জায়, পোশাক-আসাকে, পাশ্চাত্যের অনুকরণ বা পাশ্চাত্যের ঢঙয়ে না চললে বা মুখে ইংরেজি বুলি না থাকলে নিজেকে ঠিক চৌকশ লাগে না। তাই কাকের ময়ূর পুচ্ছ ধারণের মতো বিদেশি সংস্কৃতিতে এ প্রজন্ম গা ভাসিয়ে চলছে।

শুধু নগর নয়, এই মানসিকতা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও আজ পৌঁছে গেছে। অলিতে, গলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল। নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত সবাই ভর্তির আশায় সন্তানদের নিয়ে ছুটছেন ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলির দুয়ারে দুয়ারে। একশ্রেণীর অভিভাবকদের ধারণা এসব তথাকথিত স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করাতে না পারলে সন্তানদের বুঝি যথার্থ মানুষ করে তোলা যাবে না। অথচ এসব স্কুলে ও-লেভেল বা এ-লেভেলে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের ইতিহাস না পড়ে পড়ছে ইউরোপ, আমেরিকার ইতিহাস। বাবা মায়েরাও মনে করেন নূতন প্রজন্মকে যোগ্য করে তোলার জন্যে ইংরেজি ভাষা ছাড়া বিকল্প নেই এমন কি অনেক হতদরিদ্র দিনমজুর পর্যন্ত নিজের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে তার সাধ্যের বাইরে খরচ করে সন্তানকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পাঠাচ্ছে।

দেশজুড়েই বলতে গেলে আজকাল বাংলা সংস্কৃতির চেয়ে তাই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির চর্চাই বেশি হচ্ছে। আর এ কারণেই অশিক্ষিত দিনমজুরটিরও স্বপ্ন ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে সন্তানকে লেখাপড়া শেখাতে পারলে বোধ হয় তার স্বপ্ন পূরণ হবে।

ছেলেমেয়েরা এসব প্রতিষ্ঠানে সঠিক উচ্চারণে বাংলা বর্ণ বা উচ্চারণ না শিখলেও ইংরেজি বলতে পারছে আর আর ইংরেজিটা সঠিক বলতে পারলেই চাকুরিও জুটে যাচ্ছে একথাও মিথ্যে নয়।

শুধু ইংরেজি মাধ্যম স্কুল নয় তার পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে হিন্দি সিনেমা বা হিন্দি গান যা বাংলা ভাষা-ভাষী তরুণ প্রজন্মদের কাছে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে চলেছে। অথচ গান, কবিতা, নাটক, সিনেমা, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদির চর্চা বাংলায় না হলে এর উত্তরণ কখনোই সম্ভব নয়। বেশিদিনের কথাতো নয়, এইতো উর্দু হরফে বাংলা লিখবো না বলে আমরাই তো ভাষার জন্যে আন্দোলন করেছিলাম। অথচ আজ আমাদের সন্তানেরা ইংরেজি বর্ণ দিয়ে নির্বিবাদে দিব্যি বাংলা লিখে চলেছে। এসব আমাদের সন্তানদের উপরে কে বা কারা চাপিয়ে দিলো ?

বাংলা ভাষার আন্দোলন শুধু ভাষা নয়, ভাষার সাথে বাঙ্গালী অস্তিত্বের যোগও স্থাপন করেছিলো এটাই বা আমরা ভুলি কি করে ? মে দিবস, নারীদিবস, মানবাধিকার দিবসের মতো বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রাম দিবস বিশ্বব্যাপী এখন পালিত হচ্ছে । এটা আমাদের জন্যে এক পরম গৌরবের বিষয় । বাংলায় কথা বলা ও লেখাপড়ার অধিকারের দাবীতে বাঙালীদের বলিদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৯৯ সনেই উনেস্কো ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে যেখানে ঘোষণা করেছে সেখানে ভাষার মাস এলেই কি শুধু আমার ভাইয়ের দায় এড়ালে চলে ?

তিরিশ কোটি মানুষের ব্যবহারে যে ভাষা এক প্রাণবন্ত ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে সেখানেই ইংরেজি হরফে লেখা এসব বাংলা যে ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে কতটা বিরূপ প্রভাব ফেলছে তা এই প্রজন্মকে অনুধাবন করলেই বোঝা যায় ।

কবিগুরুর একটা গানের চরণের উদাহরণ দিয়েই বলা যায় ''মরণরে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান'' ।

চমৎকার এই বাণীকে বাংলা বর্ণ দিয়ে না লিখে ইংরেজি বর্ণ দিয়ে লিখতে গেলে লিখতে হয়

Moron re tuhu momo sshyamo soman.

শুধুমাত্র এই ইংরেজি বর্ণ ব্যবহারের জন্য এই অসামান্য কবিতাটির ভাব প্রকাশ কি মারাত্মক ভাবেই না হোঁচট খেলো ? ইংরেজি অক্ষরে প্রকাশ করে কি মনের ভাবটা প্রকাশ করা গেল বা তৃপ্তিটা আসলো ?

শুধু লেখাই বা বলি কেন ? ইংরেজি বলার ঢঙয়ে বিভিন্ন মিডিয়ায় আজকাল বাংলা ভাষার বিকৃত উচ্চারণের ব্যবহারও অহরহ শোনা যাচ্ছে ।

ধ্বনি তত্ত যে কোন ভাষার জন্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । বিকৃত ধ্বনি তত্তে শব্দ উচ্চারণ ভাষার জন্যে একটা হুমকি স্বরূপ । ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই সমস্যা প্রকট । স্বভাবতই তাই এই প্রকাশ ভঙ্গী বাংলা ভাষার স্বকীয়তাকে একদিকে যেমন নষ্ট করে চলে আবার অন্য দিকে ধ্বনি তত্তের সাথেও ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকা ভাবধারাকেও অন্য দিকে মোড় ফিরিয়ে দিচ্ছে । ভাব বা আবেগ তো শুধু শব্দেরও ওপরে নির্ভর করে না উচ্চারণ ভঙ্গির ওপরেও নির্ভর করে । এটা ঠিক যে আমরা এখন বৈশ্বিক আবহে বাস করছি । তাই ইংরেজি ভাষাকে বাদ দেয়া যাবে না । তবে মাতৃভাষা আর বিদেশি ভাষার পার্থক্যটা আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে । ইংরেজিকেই ইংরেজির মতো আর বাংলাকে বাংলার মতো করে বলতে হবে, লিখতেও হবে ।

আশার কথা হচ্ছে এই যে বৈশ্বিক আবহে বাসের সাথে আমরা এখন ভার্চুয়াল পৃথিবীর আলো বাতাসও গায়ে মাখছি । ফেসবুকের কল্যাণে তথ্য আদানপ্রদানেও অংশ নিচ্ছি অথচ সেই ফেসবুকেও বাংলা লিখতে গিয়ে অনেকেই বাংলা লেখার অভিনব সুযোগ থাকা সত্তেও ইংরেজির অক্ষরের সাহায্য কেন নিচ্ছেন তা বোধগম্য নয় ।

তরুণ প্রজন্ম কি জানে যে ভাষার মাধুর্য্যে বাংলা এতটাই হৃদয়গ্রাহী যে এই ভাষার প্রতিম চর্চার কাছে বিশ্বের তাবৎ ভাষা একেবারেই ম্লান ? বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে তাই বাংলা ভাষা জয় করে নিয়েছে বহু মানুষের হৃদয় ?

ভাষার মানদন্ডে একটি জাতিকে যদি বিচার করতে হয় তাহলে বাঙালি জাতি সেই গৌরবের দাবিদার শুধুমাত্র ভাষার জন্যে পৃথিবীর আর কোন জাতিকে বুঝি এত রক্ত দিতে হয়নি ।

বিবর্তন থেকে রক্ষা করার জন্যে ও দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে প্রমিত বাংলা করা হয়েছিলো অথচ ইদানিং প্রমিত বাংলার ব্যবহারও সমাজের সর্বস্তরে লক্ষ্যনীয় মাত্রায় কমে যাচ্ছে, অফিস-আদালত, স্কুল, কলেজ, এমনকি টিভির নাটক, টকশোতে সবখানেই এখন আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষার প্রভাব প্রত্যন্ত প্রকট ভাবে দৃশ্যমান ।

বাংলা ভাষাকে শুদ্ধ ভাবে জানা ও বলা যেমন প্রয়োজন ঠিক তেমনি উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাগুলিও জানা প্রয়োজন । প্রমিত বাংলা আর আঞ্চলিক বাংলার মিশ্রণ কিছুতেই কাম্য হতে পারে না । এই মিশ্রণের জন্যে মূলত দায়ী বেসরকারি গণমাধ্যম ও টিভিতে প্রচারিত বিনোদন মূলক অনুষ্ঠানগুলি ।

পৃথিবীতে প্রথম সারির যত ভাষা বিদ্যমান তার মধ্যে বাংলা ভাষা তার নিজস্ব সঞ্জীবনী শক্তি ও নিজ বৈশিষ্টের

ওপরে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। কাজেই আমরাই যদি প্রমিত বাংলার এই মৌলিক মান বজায় রাখতে না পারি তাহলে একসময়ে আমাদের এই গৌরব হারিয়ে যেতে বাধ্য।

কাজেই প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই প্রমিত বাংলা উচ্চারণে শিক্ষকদের যথার্থ ভূমিকা রাখতে হবে। স্কুল, কলেজের ব্যবহারিক ভাষা যেন আঞ্চলিকতা মুক্ত থাকে সেদিকে নিশ্চয় দৃষ্টি দিতে হবে।

জানি এটা বিশ্বায়নের যুগ। জীবন জীবিকার টানে আর অভিবাসন প্রক্রিয়ার জন্য ক্রমবর্ধমান বাঙ্গালিরা বিভিন্ন দেশে ছুটছে। বিভিন্ন দেশে অভিবাসী হওয়া প্রবাসী বাঙ্গালির সংখ্যাও এখন তাই নিতান্ত কম নয়। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের এই ব্যাপ্তি তাই কম নয়। বাংলা ভাষা ভাষী এই সব মানুষের সংখ্যা অন্যান্য ভাষা ভাষীর চেয়ে বরং বেশি। এটা এক আনন্দের বিষয়।

অর্থনৈতিক কারণে ও সাংস্কৃতিক একাকীত্ব করণের ফলে মানুষ নির্দিষ্ট অঞ্চল ছেড়ে অন্য অঞ্চলের ঘর বাঁধে, যার ফলে তাদের সেই অঞ্চলের ভাষাকেও গ্রহণ করতে হয় এবং এক সময়ে তাই নিজের ভাষাকে আর ধরে রাখতে পারে না।

বাঙ্গালি ছেলে মেয়েরাও এখন নানা কারণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় তাই বাংলা ভাষার গন্ডীও বিস্তৃতই বলা চলে। তাবে আশার কথা এই যে এই সব বাঙ্গালিরা যেখানেই গেছেন সেখানেই বাঙ্গালি সংস্কৃতি ও সাহিত্যকেও সাথে করে নিয়ে গেছেন অনেকেই বাংলা সাহিত্যের নিয়মিত চর্চাও করছেন নিজেদের আত্মপ্রকাশের তগিদেই। কারণ শেকড়ের টান বড় টান। একে কখনো ভোলা যায় না।

এটা খুবই আশার কথা যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ফেসবুক এখন এক বিশাল মঞ্চ। এই মঞ্চে চোখ রাখলেই দেখা যায় সব বয়সী মানুষের ভাবনা চিন্তার বর্ণাঢ্য সব কথা, যাপিত জীবনের চমৎকার সব ঘটনা বা গল্প। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাঙ্গালিরা এই মঞ্চে এখন এক সাথে এসে দাঁড়িয়েছে। বাংলা ভাষাকে তাই বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেবার ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার সুবর্ণ সুযোগ এখনই।

তবে এটাও ঠিক এই প্রজন্মের তরুণ তরুণীরা নিজেদের তথাকথিত স্মার্ট ও আধুনিক প্রমান করার জন্যে ফেসবুকে কিছু কিছু অদ্ভূত ও বিকৃত শব্দের ব্যবহার করছে যার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বিকৃত এই সব শব্দ মজা করে বললেও সেসব শব্দ কিন্তু ফেসবুকে সীমাবদ্ধ থাকছেনা। ফেসবুক ছাড়িয়ে সাধারণ মানুষদের মধ্যে ও ঢুকে পড়েছে।

যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মনচায়কে এরা বলে মুঞ্চায়। ফ্রেন্ডস কে ফ্রান্স, হবে কে হপে, স্মার্টকে ইসমার্ট, মেরে ফেল কে মাইরালা, উপরকে উপ্রে।

বন্ধুরা আমার কি হবে কে বলে বন্ধুড়া আমার কি হপে ? ফ্রান্স কি করবার লাগছস ?

ইত্যাদি এমন বহু বহু শব্দ প্রতিনিয়তই অহরহ ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। এছাড়াও বাংলা বর্ণকে বিদেশিদের মতো উচ্চারণ করার একটা প্রবণতাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলা ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে এইসব অদ্ভূত আর বিকৃত শব্দ এক ধরণের যাচ্ছেতাই চর্চা বললেও কম বলা হয়। ফেসবুকের মত বিশাল এই মঞ্চের অপব্যবহার কিছুতেই করতে দেয়া যাবে না। এই অপচর্চা থামিয়ে ফেসবুক মঞ্চ সুযোগের সদ্ব্যবহার বাঙ্গালিদেরই করতে হবে আর এ জন্যে বাংলা ভাষা চর্চার জন্যে জোর আওয়াজ তুলতে হবে বিশ্বের প্রতিটি বাঙ্গালির। এর দায়ভার আমরা কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারি না। কারণ এটা আমাদের মাতৃভাষা। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্যেই এটা আমাদের করে যেতে হবে।

এটা সত্যি যে যুগে যুগে বিবর্তন আর পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই ভাষা সমৃদ্ধ হয়। কারণ ভাষা মূলত শব্দের সমাহার ছাড়া আর কিছু নয়। কাজেই বাংলাভাষাও এর বাইরে নয়। তবে পরিবর্তনেরও একটা সীমারেখা থাকা দরকার, মূল বাংলা ভাষার পরিবর্তন বা বিবর্তনকে এই সীমারেখার মধ্যে ধরে রাখতে পারলে তা কখনোই আর পুনরুদ্ধার করা যাবে না। শুধু মুখের কথায় নয় কাজ দিয়ে প্রমাণ করতে হবে আমরা সত্যিকার অর্থেই আমাদের ভাষাকে ভালোবাসি। আমার ভাষা যে আমার রক্তে আর প্রাণে মিশে থাকা ভালোবাসার অহংকার। আমার নিজের কাছে ফিরে আসার রাস্তা। পরের প্রজন্মদের মায়েদের যেন এটা বলতে না হয় যে আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসেনা।

হারান মাস্টারের কষ্ট

রবিরশ্মি ঘোষ

হারান মাস্টারের বড় কষ্ট।

না, কষ্টটা শারীরিক না। বয়েস প্রায় সত্তর হতে চলল কিন্তু এখনো তার সাথে হাঁটতে গিয়ে জোয়ান ছোকরারাও হাঁপিয়ে ওঠে। স্কুল থেকে রিটায়ার হওয়ার পরও শরীরটা কে সচল রেখেছেন। ছোট মফঃসল শহর। তাই মাঝে মাঝেই পুরনো ছাত্রদের সাথে দেখা হয়, অনেকেই বড় বড় ভুঁড়ি বাগিয়ে ফেলেছে তিরিশ পার হতে হতেই। হারান মাস্টার কিন্তু এখনো বেত-এর মত ছিপছিপে। তার মনে আছে, প্রথম চাকরিতে ঢোকার পর সহকর্মীরা সব তাকে গান্ধীজির লাঠি বলে ডাকতেন।

কষ্টটা তার মনে। কিন্তু কাউকে বোঝাতে পারেন না ব্যাপারটা। যাদেরকে বলেছেন তারা বেশির ভাগই বলে এ নাকি তার দুঃখ বিলাস। এই তো সেদিন বহুদিনের বন্ধু হরেন মিত্তির বললে, 'তোমার সমস্যাটা কি বল দিকি হে ? দিব্যি সোনার সংসার। অমন লক্ষীমন্ত গিন্নী; হীরের টুকরো ছেলে বিদেশে এত ভালো চাকরি করছে তাও নাতি কে নিয়ে প্রতি বছর এসে দেখা করে যায়। মেয়ে কলকাতায় রিসার্চ করেছে, সেও প্রতি মাসে একবার করে আসছে। এতসব থাকতেও এত দুঃখ কিসের শুনি ?'

হারান মাস্টার কিছু বলতে পারেননি। কারণ তিনি জানেন ওরা বুঝবে না। এক এক সময় ভাবেন যে এটা তারই দোষ। ইংরেজির মাস্টার ছিলেন। ছোট থেকে ছেলেকে খুব ভালো করে ইংরেজি শিখিয়ে ছিলেন। হ্যাঁ, বাংলা শেখাতেও কসুর করেন নি। একটা জিনিস সব সময় ছেলেকে শেখাতেন, সেটা হলো যে কোনো ভাষা কে ভালবাসা। ছেলেও তার সব বিষয়ে ছিল তুখোড়। তাই মফঃসলের স্কুল থেকে পড়াশোনা করলেও তার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে বা ভালো চাকরি পেতে কোনো অসুবিধা হয়নি।

সেই চাকরি সূত্রেই তাকে যেতে হয়েছে এখন অস্ট্রেলিয়া, তার সঙ্গে হারান মাস্টারের পুত্রবধু এবং অতি আদরের নাতি। সেখান থেকেই সমস্যার সূত্রপাত। দেশে থাকতে ছেলে থাকত বেঙ্গালুরু। তখন হারান মাস্টার আর তার স্ত্রী প্রতি বছর বেশ কয়েক মাস কাটাতেন ছেলের সাথে। নাতির সাথে খেলা করার, তাকে চোখের সামনে বড় হতে দেখার অবাধ সুযোগ ছিল। এখন আর তাকে সামনে পান না, ফোন বা স্কাইপ এ যোগাযোগ হয় অবশ্য কিন্তু দুধের সাধ কি আর ঘোলে মেটে ? তার ওপর আবার গত কয়েক মাস যাবত এক নুতন সমস্যা দেখা দিয়েছে। নাতি দেশে থাকতে দিব্যি বাংলা বলত কিন্তু ওখানে গিয়ে স্কুলে ভর্তি হওয়ার কয়েক মাস পর থেকেই বাংলা বলা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। শুধু ইংরেজিতে কথা বলে। তাতে হারান মাস্টারের এমনি অসুবিধে নেই, কারণ তার নাতির সাথে ইংরেজিতেই কথা হয়ে যায় কিন্তু তার গিন্নী এখন নাতির কথা আর কিছুই বুঝতে পারেন না। গিন্নির দুঃখটা তিনি অনুভব করতে পারেন তবে এর থেকেও একটা বড় প্রশ্ন তাকে সব সময় তাড়া করে বেড়ায় আজকাল। বাংলা ভাষাটা কি এইভাবেই পৃথিবীর বুক থেকে একটু একটু করে হারিয়ে যাবে ?

কথাটা ভাবতেই তার বুকের ভেতরটা কেমন হুহু করে ওঠে। এই ব্যাপারটা রোজই ভাবেন। আজও এটাই ভাবতে ভাবতে কখন যেন শহরের সীমানা ছাড়িয়ে পুরনো নীলকুঠির সামনে এসে গেছেন বুঝতে পারেননি।

বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যা নেমে আসছে। চার পাশে অস্তগামী সূর্য আলো-আধাঁরির এক অপূর্ব মায়াজাল বুনেছে। ঠিক এই সময় নীলকুঠির দিকে তাকিয়ে হারান মাস্টারের বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেমন একটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। এমনিতে তিনি খুব একটা অন্ধবিশ্বাসী লোক নন কিন্তু ভূতকে কে না ভয় পায়। ছোট বেলা থেকে এই নীলকুঠি সম্পর্কে কত কথা শুনেছেন। যদিও নিজে কোনদিন কিছু দেখেন নি তবে অনেকেই বলে এই কুঠি তে নাকি রাত বিরেতে সাহেব ভূত দেখা যায়।

শেষ বিকেলের পড়ন্ত আলোয় তাই নীলকুঠির দিকে দেখে ভেতরে ভেতরে একটু কেঁপে উঠলেন হারান

মাস্টার। না, এই সময় এদিকে আসাটা ঠিক হয় নি। এই ভেবে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা চালাতে যাবেন এমন সময় হঠাৎ একটা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলেন তিনি। 'কে আপনি' ? যান্ত্রিক কণ্ঠস্বরের প্রশ্ন। প্রচন্ড ঘাবড়ে গিয়ে দুর্দান্ত শীতেও ঘামতে শুরু করলেন হারান মাস্টার। ভূতেরা কি যান্ত্রিক স্বরে কথা বলে ? আগে তো জানা ছিল তারা নাকীসুরে কথা বলে। সত্যি কি তা কে জানে। আগে তো কখনো কোনো ভূতের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয় নি।

মনে মনে রাম জপতে জপতে পেছন ফিরলেন হারান মাস্টার। পেছন ফিরেই তার মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা। সামনে দাড়িয়ে প্রচন্ড ফ্যাকাশে মার্কা এক সাহেব। এক মাথা ক্যাটক্যাটে সোনালী চুল। একই রঙের দাড়ি। চোখে চৌকো ফ্রেমের চশমা। চশমার সাথে কি একটা যন্ত্র আঁটা, তার থেকে একটা অংশ মাথার পেছন ঘুরে কানে গোঁজা। এই ঠান্ডাতেও একটা পাঞ্জাবি পরা আর তার সাথে রংচটা জীন্স। এই কি তবে নীলকর সাহেবের ভূত ? প্রাথমিক ধাক্কা সামলে, একটু ধাতস্থ হয়ে তারপর হারান মাস্টারের মনে হল তা নীলকর সাহেব কি জীন্স আর পাঞ্জাবি পরবে, নাকি ভূত হয়ে রুচি বদলে গেছে। হতেও পারে, ভূতেদেরও তো রুচি পরিবর্তনের ইচ্ছে হতে পারে। যাই হোক, এই আধুনিক বেশে ভূতটাকে তেমন একটা ভয়ানক লাগছে না। হারান মাস্টার হরির নাম নিয়ে বুকে বল এনে বললেন; আমি হারান চন্দ্র ঘোষ। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। 'আপনি কে ?'

এই কথাগুলো বলেই তার খেয়াল হল সাহেব ভূত বাংলায় কথা বলছে কি করে। হতে পারে বহুবছর এদেশে থেকে বাংলা শিখে গেছে হয়ত। তার ভাবাটা শেষও হয়নি তার মধ্যেই আবার সেই যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর; 'বিস্কুট ভালবাসেন' অবাক হয়ে দেখলেন হারান মাস্টার যে সাহেব ভূতের ঠোঁট একদম নড়ল না। একটু আমতা আমতা করে বললেন তিনি; 'বিস্কুট তো সব বাঙালিই ভালবাসে তবে কিনা এখনো দুপুরের ভাতটাই হজম হয়নি ঠিকমত। এখন বিস্কুটের প্রয়োজন নেই।' যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর আবার বলল; ওটা আমার নাম। আমি স্ক্যান্ডিনেভিয়ার লোক। আমার নাম বিস্কুট ভালবাসেন। আমি বুঝতে পারছি আপনি অবাক হয়েছেন কিন্তু আমাদের ওখানে এরকমই নাম হয়, যেমন অর্কুটভাইক্কনেন। আমার বাবার নাম দশফুট পড়ে হাসেন।'

আপনি তাহলে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার ভূত ? তা এদেশে কি করে ?' বেশ অবাক হয়ে জিগ্গেস করলেন হারান মাস্টার।

'কে বলল আমি ভূত ? আমি একেবারেই আপনার মত জ্যান্ত মানুষ। কিন্তু আমার মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরয় না। তাই এই যন্ত্রের সাহায্যে কথা বলি।'

'কিন্তু বাংলা তো আপনার মাতৃভাষা নয়। আপনি বাংলা শিখলেন কোথায় ?'

'কে বলেছে আমি বাংলা শিখেছি। আমি শুধু চিন্তা করছি আর যন্ত্রটা আমার ভাব কে ভাষায় প্রকাশ করছে। যে ভাষায় আপনি বুঝতে পারেন সেই ভাষায়। ভাষা হলো ভাবের বাহন। মনের যে ভাবনা চিন্তা হয় তাকে যে কোন ভাষাতেই প্রকাশ করা যায়। এই যন্ত্র আমারই বানানো। অনেক বড় বড় প্রযুক্তি সংস্থা তে কাজ করেছি আমি। তারপর এক দুর্ঘটনায় আমার কথা বলার ক্ষমতা একেবারেই চলে যায়। বহুদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগি। তারপর গবেষণা করে নিজের জন্য এই যন্ত্র তৈরী করেছি। এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে এটাকে পরীক্ষা করছি।' মুগ্ধ চোখে দেখে বললেন হারান মাস্টার, 'অসাধারণ এই প্রযুক্তি। এ যে অনেক লোকের মুখে ভাষা ফোটাবে। আহা, আমার নাতিটার কাছে যদি এরকম একটা যন্ত্র থাকত তাহলে তো দিব্যি বাংলায় কথা বলতে পারত।'

বিস্কুট বলল, 'কেন আপনার নাতি বুঝি কথা বলতে পারে না ?'

হারান মাস্টার বললেন, 'না তা নয়। তবে বিদেশে গিয়ে বাংলা বলা একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। তাই আমার বড় দুঃখ। কেউ বোঝে না আমার এই দুঃখের কথা। বাংলা ভাষাটা কি একদিন এভাবেই হারিয়ে যাবে ?'

'তা কেন হবে। আজকের প্রযুক্তির সাহায্যে যে কোনো ভাষাকেই বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। আমার এই যন্ত্র যদিও এখন বাজারে আসেনি কিন্তু অনেক অন্য প্রযুক্তি

কিন্তু ভাষা শেখা এবং অন্য ভাষায় কথা বলা কে অনেক সহজ করে দিয়েছে । এই দেখুন আপনাকে একটা উদারহরণ দেখাই ।'

বিস্কুট তার পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা আধুনিক মোবাইল ফোন বের করল, যাকে আজকাল স্মার্টফোন বলে । হারান মাস্টার এ জিনিষটা চেনেন কারণ কয়েকমাস আগেই তার ছেলে তাকে এরকম একটা মোবাইল দিয়ে গেছে । তিনি ওটা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাননি, তাই ওটা আপাতত বাক্সবন্দী হয়েই আছে । তিনি মাত্র বছর দুই আগে কোনো রকমে রাজি হয়েছিলেন মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে । এখন একদম সাধারণ ওই মোবাইল দিয়ে কথা বলার কাজ টুকুই করেন ।

বিস্কুট এবার তার ফোনের স্ক্রীনের মধ্যে একটা কী বোর্ড খুলল । তারপর ওটাতে একটা মাইকের মত দেখতে বোতাম টিপে হারান মাস্টারকে বলল, 'নিন, কথা বলুন ।' হারান মাস্টার একটু ইতস্তত করে বললেন, 'এতে কি হবে ?'

তারপর অবাক হয়ে দেখলেন যে স্ক্রীনের ওপর তার বলা কথা গুলিই ফুটে উঠেছে বাংলা হরফে । তারপর বিস্কুট তাকে দেখালো গুগল ট্রান্সলেটরের মধ্যে দিয়ে তার বলা বাংলা কথা গুলি কি ভাবে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় সহজেই অনুবাদ হয়ে যাচ্ছে এবং একটা মেয়ের গলায় সেই ভাষাতে কথাগুলি শোনাও যাচ্ছে । বিস্কুট তাকে বলল এরকম নাকি আরো অনেক কিছু কাছে । গুগল পিক্সেল বাডস বলে নাকি একটা যন্ত্র আছে যেটা কানে ঢুকিয়ে যে কোন ভাষার সরাসরি অনুবাদ শোনা যায় ।

বিস্কুট বলল, 'আপনার নাতি আশা করি বাংলা ভাষায় নিজেই কথা বলবে । আর তা যদি না বলে একান্ত, তাহলে এরকম কোনো একটা প্রযুক্তির ব্যবহার করে তার সাথে কথা বলুন । এর থেকে ও ধীরে ধীরে ভাষাটা এক সময় শিখেও যাবে ।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন হারান মাস্টার । তার মুখে এক নতুন খুশির ঝলক ।

বিস্কুটের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাকে কি ভাবে ধন্যবাদ দেব জানিনা । আপনি আমার কষ্ট অনেকটা লাঘব করলেন । আসুন না আমার সাথে আমাদের বাড়িতে । গিন্নীও কথা বলে খুশি হোত ।'

বিস্কুট বলল, 'না এবার আমার যেতে হবে । আমি ভূত না । তবে আমি বর্তমানও না । আমি ভবিষ্যৎ । ২০৫০ সাল থেকে এসেছি । আমার সময় যানের ব্যাটারী প্রায় শেষ হওয়ার পথে । তাই ফিরে যেতে হবে । আবার দেখা হবে কখনো ।'

এরপর হারান মাস্টারকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বিস্কুট নীলকুঠির দিকে হনহন করে হাঁটা দিল । হারান মাস্টারও নীলকুঠির ওপর পড়ন্ত বেলার শেষ রোদের ঝিলিকটুকুর দিকে দেখে আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলেন । ছেলের দেওয়া মোবাইলটা বাক্স থেকে বের করবেন এবার ।

তবে হ্যাঁ, বিস্কুট এর কথা কাউকে বলা যাবে না । কেউ বিশ্বাস করবে না ।

ভাষা

স্বর্ভানু সান্যাল

ঠাম্মার একটা আঙুল নিজের আঙুলে জড়িয়ে নদীর বাঁধানো ঘাটটায় বসেছিল কাহিনী । তখন সবে সন্ধে নামছে । নদীর ওপারে ঐ দূরে লাল তামার চাকতির মত সূর্যটা গাছগাছালির মধ্যে মুখ ডুবিয়ে আহ্লাদে আলো আর রঙের খেলায় মেতেছে । আকাশে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা মেঘখন্ড গুলোকে কখনো লাল, কখনো কমলা রঙে রাঙিয়ে দিয়ে যেন কোন খেয়ালী চিত্রকর সমগ্র পরিবেশটাকে আরক্তিম করে তুলেছে । এইরকম সময়গুলোতে যেন কোন এক অদৃশ্য শক্তি মানুষকে মুখে আঙুল দিয়ে চুপ করিয়ে দিয়ে যায় । ষোলো বছরের ফুটফুটে মেয়ে কাহিনী, সারাক্ষণ যার মুখে ফুলঝুরি ছোটে, সে অব্দি চুপ করে দেখছিল নদীর জলে আকাশের থেকে ঝরে পড়া সোনা আলো আর তার আবীর রঙের ঝিকিমিকি । তার কোমর লম্বা চুল মোটা ডাঁটো বিনুনি করে তার সদ্যোদ্ভিন্ন বুকের ওপর আলগোছে পড়ে আছে । সন্ধ্যের মৃদুমন্দ হাওয়ায় বিনুনির শেকল থেকে মুক্তি নিয়ে দু এক গুচ্ছ অবাধ্য চুল মুখের ওপর এসে পড়েছে । চোখের ওপর থেকে চুল সরাতে সরাতে কাহিনী জিগ্যেস করে উঠল ''আচ্ছা গ্র্যানি, শুনেছি, হোয়েন উ ওয়্যার এ কিড, তুমি আর তোমার গ্র্যানিও এই নদীর পাশে এসে বসতে ।''

''হ্যাঁরে । আমিও ঠিক তোর মত আমার ঠাম্মার হাত ধরে এই নদীর ধারে বসে কত বিকেল থেকে সন্ধ্যে হতে দেখেছি । কিন্তু আজকাল আর এই নদীটাকে ঠিক চিনতে পারি না । অনেক বদলে গেছে ।''

''কেন ? সেই ছেলেবেলা থেকে দেখছ । তাও চিনতে পারো না কেন ?''

''আসলে নদীরা তো বহতা । সময়ের সাথে সাথে ওরা গতি পরিবর্তন করে । ক্রমাগত রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে যায় । আগে এর জল কেমন হাল্কা নীল ছিল । এলন কেমন ছাইরঙা হয়ে গেছে । ওপর থেকে জলের মধ্যে যে মাছগুলো দেখতে পাওয়া যেত তারও রঙ, আকৃতি, প্রকৃতি বদলে গেছে ।''

''বহতা ? ইউ মীন ফ্লোয়িং রাইট ? কাম অন্ গ্র্যানি, তুমি না ? মাঝে মাঝে কোন ভাষায় যে কথা বলো বুঝতেই পারি না । এনিওয়েজ, আচ্ছা একটা কথা বলো । তোমার গ্র্যানির সাথে তোমার গ্র্যানপার পারহ্যাপ্স লাভ ম্যারেজ তাই না ?''

''ধুর বোকা । তখনকার দিনে এই আজকালকার মত প্রেম টেম হত না । আমরা, আমাদের মা ঠাকুরমারা তোদের মত, ওই তোদের ভাষায়, আল্ট্রামর্ডান ছিল না । বুঝলি ? কেন বল তো ? তোর কেন মনে হল আমার দাদু ঠাকুরমার প্রেম করে বিয়ে ?''

''না মানে তোমার গ্র্যানি তো আই গেস বাঙালি না । তাই ভাবছিলাম ।''

''ওমা । দিদিমা বাঙালি নয় কেন রে ? দিব্যি নৈহাটির মেয়ে । অবাঙালি হতে যাবে কোন দুঃখে ?''

''বারে তুমিই তো বলেছিলে তোমার গ্র্যানির নাম, লেট মী রিমেম্বার, কুমুদিনী । রাইট ? তো সেটা তো আর বাংলা নাম নয় । ইন ফ্যাক্ট বাংলাতে এরকম কোন শব্দই নেই ।''

''ধুর বোকা । কুমুদিনী একদম বাংলা শব্দ । এক ধরণের ফুল । যেমন আমার নাম কথা । তোমার মায়ের নাম যেমন করবী সেরকম ।''

''রিয়েলি ? উ মীন কুমুদিনী ইজ এ বেঙ্গলি ওয়ার্ড ? তোমার নাম, মায়ের নাম — কথা, করবী একসেটেরা বাংলা শব্দ জানি । কিন্তু কুমুদিনী ?'' অবিশ্বাসী চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকে কাহিনী ।

বিরক্তিতে মাথা নাড়েন বৃদ্ধা কথা সান্যাল । ''হ্যাঁ রে । সত্যি কি দিনকাল এলো ! তোরা মানে তোদের প্রজন্ম বা তার পরের পরের প্রজন্ম তোরা কি বাংলা ভাষাটাকে পুরোপুরি ভুলে যাবি ? আজ থেকে আর একশ বছর পর ভাষাটা কি সত্যিই থাকবে ? তুই তো ইংরেজি

শব্দ ছাড়া এক মিনিটও কথা বলতে পারিস না । আর বাংলার অর্ধেক শব্দ অব্যবহারে অপ্রচলিত হয়ে পড়ছে দেখছি । তোর দাদুর নাম ভাস্কর । সূর্যের প্রতিশব্দ । ভাস্কর তো দূরে থাক তোরা সূর্য কথাটাই ভুলতে বসেছিস । রৌদ্রোজ্জ্বল দিন হলে সেটাকে বলিস সানি ডে । কে জানে বাবা এই বাংলা ভাষাটা থাকবে তো ?''

কাহিনী মুখে মিচকে ফাজিল হাসি উঠে দাঁড়িয়ে পেছন থেকে কথার গলা জড়িয়ে ধরল । গাঢ়স্বরে ডাকল ''ঠাম্মা'' । সে জানে গ্র্যানিকে ঠাম্মা বলে ডাকলে তার সব রাগে জল ঢালা হয়ে যায় । কথা কপট রাগ দেখিয়ে বললেন ''বল'' ।

''তোমায় কে বলেছে এগুলো ইংরেজি শব্দ । এই যে সানি ডে, লাভ ম্যারেজ, গেস যে শব্দ গুলো আমি ইউজ করেছি এতক্ষণ, এগুলো তো বাংলা শব্দই ঠাম্মা ।''

''আবার ফাজলামি করছিস ? এগুলো কবে থেকে বাংলা শব্দ হল শুনি ?''

''ধরো যদি বলি, আজ থেকে ঠাম্মি ? একটা কথা বলো । আক্কেল, আসল, এলাকা, ওজন এই শব্দগুলো বাংলা তো ঠাম্মা ?

''হুম ।''

''আর, আর আওয়াজ, আন্দাজ, আয়না, খারাপ ?''

''ও মা, ওগুলো বাংলা হবে না কেন ? তুই কি বলছিস আমি কিছুই বুঝতে পারছি না ।''

''এই ওয়ার্ডস গুলো ঠাম্মা বাংলার পার্ট ছিল না ফর ইটার্নিটি । প্রথম চারটে শব্দ আরবি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে এসেছে । পরের চারটে ফার্সী ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে এসেছে । এলাকা শব্দের আসল আরবি শব্দ ইলাকাহ, খারাপ শব্দের ফার্সী শব্দ খারাব ।''

''তুই কি বলতে চাইছিস ?''

''বেঙ্গলি যদি এতদিন ধরে অন্য অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে ওয়ার্ড রিসিভ করে এসেছে তবে আজ কেন তার এক্সসেপশান হবে বলো তো ? দাদু তো বলে স্যাংস্কৃট এক সময়ে এত রিজিড হয়ে গেছিল যে ইট রিফিউজড টু অ্যাডপ্ট । তাই সাধারণ মানুষ স্যাংস্কৃটে নয়, প্রাকৃতে কথা বলত । স্যাংস্কৃট থেকে যায় লেখার ভাষা হিসেবে । আর স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজটা, তোমরা যেটাকে কথ্য ভাষা বলো, সেটা গ্র্যাজুয়ালি বদলাতে থাকে । আর তার ফলেই স্যাংস্কৃটের ইভেনচুয়াল ডেথ ।''

''তার মানে . . .''

''তার মানে,'' কাহিনী ঠাম্মার গালে একটা চুমু খেয়ে বলে উঠল ''ইংলিশ ওয়ার্ডগুলোকে রিজেক্ট করে নয়, অ্যাক্সেপ্ট করেই তোমার আদরের বাংলা ভাষা বাঁচবে, মাই ডিয়ার ঠাম্মি ।''

''কি বলছিস ? এই এত এত ইংরেজি শব্দ আমাদের শব্দ বলে মেনে নিতে হবে ?''

''ওরাও নিচ্ছে ঠাম্মা । প্রতি বছর ইংরেজিতে ঢোকে ক্লোজ টু ফাইভ টু টেন ওয়ার্ডস । ইয়োগা, বাজার, জাংগল এগুলো অক্সফোর্ড ডিকশানারিতে জায়গা পেয়েছে । টু দ্যাট, ইংলিশ যত ওয়ার্ড বড় করে তার থেকে বেশি ওয়ার্ড লেন্ড করে । কিন্তু তবু নিচ্ছে তো । বাংলাও কেন নেবে না ? তাছাড়া কান বন্ধ করে বসে থাকলে ভাষার ইনফিল্ট্রেশান তো তুমি স্টপ করতে পারবে না ঠাম্মা ? একটা ল্যাঙ্গুয়েজের পাওয়ারের কাছে আমরা ওয়ে টু উইক । সে এক নদীর মত । নিয়ম মেনে চলা তার স্বভাব নয় । কখনো তার এক জায়গায় চড়া পড়ে, শুকিয়ে যায় আবার অন্য জায়গায় সে পাড় ভেঙ্গে নতুন পথ করে নেয় । কখনো অন্যান্য শাখানদীর জলধারা এসে মেশে । সেটাকে কনটামিনেশান না ভেবে এক্সপ্যানশান ভাবলে প্রবলেম হয়ে যায় । আমাদের বাংলার বলার ভাষা আর লেখার ভাষা যদি প্রচন্ড ডিফারেন্ট হয়ে যায় ঠাম্মা তবেই বাংলা ভাষার মৃত্যু হবে । তাই সুবের মত মুখ ঘুরিয়ে বসে না থেকে চলো এই ওয়ার্ডগুলো আমরা নিজেদের শব্দ বলে গ্রহণ করে নিই । এই আমদানি করা শব্দগুলোকে লেখার জন্য প্রপার স্পেলিং ডিভাইস করি । চলো আমরা ''শব্দ'' আর ''ওয়ার্ড'' কে আমরা সিনোনিম, তোমরা কি যেন বলো, হ্যাঁ, সমার্থক শব্দ বলে অ্যাক্সেপ্ট করে নিই । করা যায় না ঠাম্মা ?''

''কথাটাতে তোর যুক্তি আছে ।''

''যুক্তি আছে । আমি লজিকাল কথাই বলছি । এই যে আমি লজিকাল ওয়ার্ডটা ইউজ করলাম, লিখতে গেলে

কেন এর বাংলা ট্রান্সলেশান মনে করতে মাথার চুল ছিঁড়ব ? লজিকাল ওয়ার্ডটা বহু ব্যবহারে এখন আমাদেরই শব্দ হয়ে গেছে । লেখার ভাষা আর বলার ভাষার মধ্যে প্যারিটি থাকতে হবে, সামঞ্জস্য থাকতে হবে । আমি অলরেডি বেঙ্গলি নভেলের অনেক শব্দ বুঝতে পারি না । কারণ প্রচলিত ইংলিশ শব্দ ব্যবহার না করে তার অভিধান স্বীকৃত বাংলা শব্দ ইউজ করা হয় । এটাতো এক ধরনের ইউজলেস শভিনিজম বা তোমার ডিকশানে যাকে বলে অপ্রয়োজনীয় বিদগ্ধতা । তুমি এই নদীটাকে চিনতে পারো না বললে না ? যদি চিনতে পারার জন্য এই নদীটার পাড় ধরে শক্ত বাঁধ দিয়ে নদীটাকে বদলাতে না দিতে তবে কে বলতে পারে হয়তো নদীটা শুকিয়ে যেত, আমরা নদীটা দেখতেই পেতাম না । তোমার সাথে নদীটার পাড়ে বসে এই সানসেটটা দেখতেই পেতাম না । তাই বলি কি . . . বাংলা ভাষার সো কলড ফ্ল্যাগ বিয়ারার বা ধ্বজাধারীদের বলো যে ভাষাটাকে এক্সপ্যান্ড করতে দিতে । এই নতুন শব্দগুলোকে বাঙলারই শব্দ বলে স্বীকৃতি দিতে । কথা দিচ্ছি আমার ঠাম্মির ভাষাকে আমি, আমরা মরতে দেব না । অনেক বকে ফেলেছি । এবারে আমার সুইট ঠাম্মি আমার এই গালে, হ্যাঁ ঠিক এইখানে, একটা কিসি দিয়ে দাও তো ।''

কাহিনীর দৃষ্টিকোণটা দেখে অশীতিপর বৃদ্ধা কথার মুখে হাসি ফুটে ওঠে । বাংলা ভাষা বাঁচবে । তার আদরের নাতনি কাহিনীর, কাহিনীদের হাত ধরেই বাঁচবে । বিদেশী শব্দ গ্রহণ করে ওরা বাংলা ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ করবে । ওরা ওদের মাতৃভাষা, মাদার টাঙকে মরতে দেবে না । পরম আদরে চুমু খান তিনি তার চোখের মণি নাতনিটিকে ।

ঠাকুমা-নাতনি, কথা ও কাহিনী, অনেকক্ষণ গললগ্ন হয়ে থাকে । ততক্ষণে গোধূলির আলোর খেলা মিলিয়ে গিয়ে সন্ধ্যে নেমেছে । নদী সংলগ্ন গাছগুলো স্থির হয়ে কোন সুগম্ভীরের ধ্যানে নিমগ্ন হয়েছে । ঠাম্মার কোলে মাথা রেখে শুয়ে কাহিনী বলে ওঠে ''ঠাম্মা এই রিভারটার নাম কি বলেছিলে ?''

''এটা তো একটা ছোট নদী । সেরকম কোনো নাম নেই । আমাদের এই লক্ষীকান্তপুরে এটাকে সবাই ভাসা নদী বলে । অন্য গ্রামে অন্য নাম ।''

ইয়ার্কির লেশমাত্র নেই এমন একটা গাঢ়, প্রায়-অচেনা স্বরে কাহিনী বলে ওঠে ''গ্র্যানি আমার মনে হয় লোকমুখে নদীটার নাম ভাসা হয়ে গেছে । নদীটার আসল নাম বোধ হয় ছিল ''ভাষা''।

কথা চোখ তুলে নদীটার দিকে তাকান । যেন এক নতুন আঙ্গিকে দেখতে পান নদীটিকে । তারপর অপলক দৃষ্টিতে নাতনির দিকে চেয়ে থাকেন আর তার ঘন ঝালর চুলের মধ্যে বিলি কাটতে থাকেন ।

বাংলা ভাষার বিবর্তন ও ২০৫০ সালের কল্পচিত্র

খন্দকার জাহিদ হাসান

বেশ কিছু ব্যাপারে জীবসত্তার সাথে ভাষার মিল রয়েছে । জীবসত্তার মতো ভাষাও জন্মলাভ করে ও বিবর্তিত হয় । ভাষাও ব্যাধি গ্রস্ত হয় ও আগ্রাসনের শিকার হয় — এমনকি বিভিন্ন কারণে ভাষার মৃত্যু বা অবলুপ্তিও ঘটতে পারে । গত ৫০০ বছরে এই পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক ভাষা অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর বর্তমানে এখনো প্রায় ৭০০০ ভাষা রয়েছে । তার মধ্যে আবার প্রায় ২০০০ কথ্য ভাষার প্রতিটির ব্যবহারকারীর মোট সংখ্যামাত্র এক হাজারেরও নীচে । আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ উপরোক্ত ৭০০০ ভাষার অর্ধেকেরও বেশী বিলুপ্ত হয়ে যাবে । তার মানে, গত ৫০০ বছরে প্রতি মাসে একটি করে ভাষা বিলুপ্ত হয়ে এসেছে, আর আগামী ৮০ বছরে প্রতি দুই সপ্তাহে একটি করে ভাষার অপমৃত্যু হবে ।

যে ভাষাতে যত বেশী মানুষ কথা বলে, সাধারণত সেই ভাষার আয়ু ততো বেশী হয় এবং তার বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা ততো কম থাকে । বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে অধিক সংখ্যক মানুষ কথা বলে ম্যান্ডারিন ভাষাতে । ভাষা ব্যবহারকারীর সংখ্যার ভিত্তিতে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে স্প্যানিশ ভাষা । আর আমাদের বাংলা ভাষার অবস্থান হল সপ্তম । বর্তমানে পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশে বাংলা ভাষার লেখ্যরীতির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য না থাকলেও এই দুই ভূখন্ডের কথ্য বাংলাতে উল্লেখযোগ্য ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় । বিশেষ করে বাংলাদেশের সিলেট, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলের কথ্যরূপ এতটাই বিচিত্র যে, এক এলাকার বাসিন্দারা অন্য এলাকার বাসিন্দাদের কথা বুঝতে প্রায়ই অপারগ হয় । কোনদেশের বা ভূখন্ডের যোগাযোগ ব্যবস্থাই মূলত সেখানকার কথ্য ভাষার বিভিন্নতাকে প্রভাবিত করে । অগণিত নদ নদী আর পাহাড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্লঙ্ঘ্যতা ভাষার কথ্য রীতিতে ও উচ্চারণে আঞ্চলিকতা সৃষ্টি করে । বাংলাদেশে কথ্য ভাষার বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার কারণ হিসেবে আবহমান কাল থেকে বিরাজমান যোগাযোগ ব্যবস্থার দুরাবস্থাকে চিহ্নিত করা হয় । আর সুদূর অতীতকাল হতে যোগাযোগ ব্যবস্থার এই দুর্দশার পেছনে অসংখ্য নদীনালা ও নিবিড় বনভূমির ভূমিকা রয়েছে । এখন প্রশ্ন হল, কালের বিবর্তনে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটলেও বাংলা ভাষার কথ্যরূপের সেই কথিত বিভিন্নতা কি হ্রাস পেয়েছে ? তার জবাবে বলতে হয় যে, এই ধরণের বৈপ্লবিক পরিবর্তন রাতারাতি ঘটেনা । আসলে বিবর্তনের হাত ধরে ভাষার পরিবর্তন, রূপান্তর ও সংস্কার ধীর গতিতেই সম্পন্ন হয়ে থাকে । তবে নানা ঘাত প্রতিঘাত ঘটনার ভেতর দিয়ে ভাষা এগিয়ে যেতে যেতে নতুন কোনো ধারাতে বইতে আরম্ভ করলে বা নতুন কোনো দিকে বাঁক নিলে, তা যে সবসময়েই শুভ হবে এবং ভাষার উন্নয়নে অবদান রাখবে এমন কোনো কথা নেই । বরং উল্টোটাও ঘটতে পারে । যেমন, সম্প্রতি গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ণের ফলে চলিত বাংলায় প্রচুর সংখ্যক ইংরেজি শব্দের আমদানি হয়েছে । আমি চেয়ার, টেবিল, অফিস, স্কুল, কলেজ — এই শব্দগুলোর কথা বলতে চাইছি না । এগুলো তো অনেক আগেই বাংলাতে ঢুকে গেছে এবং তাতে বাংলা সমৃদ্ধই হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায় । কিন্তু আজকাল ইন্টারনেটের বদৌলতে বাংলা ভাষাতে প্রতিনিয়ত যে সকল ইংরেজি শব্দের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটছে, সেসব শব্দের দৈনন্দিন ব্যবহার মোটেও অভিপ্রেত নয়, কারণ ঐ শব্দগুলির জুতসই বাংলা প্রতিশব্দ রয়েছে । যেমন, যারা ইউটিউবে নাটক, উপস্থাপনা ভিত্তিক বা সাক্ষাতকার ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখে থাকেন, তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, ফ্যাশন বা স্টাইলের বশবর্তী হয়ে অনেকে বাংলাতেই কথা বলতে বলতে 'সুতরাং' বা 'তাই' -এর বদলে 'সো' বলছেন, 'করিৎকর্মা'-র বদলে 'অ্যাক্টিভ' বলছেন, 'স্রেফ'-এর বদলে 'জাস্ট' বলছেন, ইত্যাদি । আর 'ধন্যবাদ' -এর বদলে 'থ্যাঙ্কইউ' তো অনেক আগেই চালু হয়ে গেছে ।

আবার ভাষা ব্যবহারকারীদের এক ধরণের আলসেমি বা অজ্ঞতার কারণেও বাংলা ভাষার চলিত রীতিতে বেশ কিছু অনাকাঙ্খিত প্রবণতা দেখা দিয়েছে । যেমন,

বাংলাদেশের সুশীল সমাজে 'আমি গান গাহিব', ও সে গান গাহিতে পারে' — এই সাধুবাক্য দুটির চলিত রূপ হিসেবে 'আমি গান গাব' ও সে গান গেতে পারে' চালু হয়ে গেছে। অথচ সঠিক চলিত বাক্য দুটি হল যথাক্রমে, 'আমি গান গাইব' ও সে গান গাইতে পারে', ইত্যাদি। একইভাবে 'চাহিতে', 'চাহিতেছেন', 'গাহিতেছেন', প্রভৃতি ক্রিয়াপদ ভিত্তিক সাধু শব্দ গুলির চলিত রূপ হিসেবে যথাক্রমে 'চেতে', 'চাচ্ছেন' ও 'গাচ্ছেন' ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ সঠিক শব্দ গুলি হল যথাক্রমে, 'চাইতে', 'চাইছেন' ও 'গাইছেন'। এছাড়া 'আসিল' ও 'আসিলেন'-এর চলিত রূপ হিসেবে ব্যাপক ভাবে 'আসল' ও 'আসলেন' ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ বিশুদ্ধ চলিত শব্দ দুটি হল যথাক্রমে 'এল' বা 'এলো' এবং 'এলেন'। চলিত বাংলাতে লিখিত বাংলাদেশের অনেক লেখকের বইতেও দেখা গেছে যে, 'পাননি' -র পরিবর্তে' পাননাই ' এবং 'ঘরে কোন খাবার নেই'-এর পরিবর্তে 'ঘরে কোন খাবার নাই' লিখা রয়েছে। এইমাত্র বর্ণিত প্রবণতাগুলি যদিও বাংলাদেশের সুশীল সমাজের মধ্যে শেকড় গেঁড়ে বসছে, তবে পশ্চিমবাংলাতে এই প্রবণতা অনেক কম বা নেই বললেই চলে।

এছাড়া ভুল বানান ও ভুল বাক্যের তো কোন সীমা-পরিসীমাই নেই। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, বিজ্ঞাপন, পোস্টার, উপস্থাপনা (মঞ্চ, রেডিও, টেলিভিশন কিংবা ইউটিউব ভিত্তিক) — সবখানেই একই অবস্থা। সবচেয়ে করুণ পরিণতি পরিলক্ষিত হয় শিল্প-সাহিত্যের ইন্টারনেট ভিত্তিক চর্চা সমূহে। যেহেতু ঐ অঙ্গনে গুণ ও মান নিয়ন্ত্রণের কোনো বালাই নেই, সেই হেতু এই তথৈঃবচ অবস্থা। আর দুশ্চিন্তার ব্যাপার হল, বর্তমান যুগে একটা সমাজের সংস্কৃতিও ভাষার ওপর সব চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করছে এই ইন্টারনেট। কয়েকদিন আগে ইউটিউবের একটি বাংলা চ্যানেলে দেখলাম, যদি এই পৃথিবী ও মানুষজাতি সমস্ত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে টিকে থাকে, তবে আজ থেকে চার-পাঁচহাজার পর পৃথিবীতে একটি মাত্র মানবজাতি, একটি মাত্র ভাষা, একটি মাত্র ধর্ম ও একটি মাত্র দেশ থাকবে। মানুষের মধ্যে বিশেষ প্রতিভা বা বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী আর কেউ থাকবে না, সবাই মোটামুটি একই ধাঁচের বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভার অধিকারী হবে এবং অবশ্যই তা এখনকার মানুষের গড় বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানগরিমার চাইতে অনেক বেশী উঁচু মাত্রার হবে। স্রেফ সস্তা আবেগের বশবর্তী হয়ে আপলোডার ভদ্রলোক ঐ মন্তব্য করেননি, অনেক যুক্তি তর্ক ও বিশ্লেষণের কষ্টি পাথরে যাচাই করে নিয়ে তবেই তিনি তা করেছেন।

যাইহোক, আমরা এখানে গোটা পৃথিবী বা সমগ্র মানবজাতি নিয়ে মাথা ঘামাতে যাচ্ছিনা। এছাড়া চার পাঁচ হাজার বছর পর নয়, মাত্র বত্রিশ বছর পর ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলা ভাষার সার্বিক চালচিত্র কোনপর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে, শুধু এটুকুই আন্দাজ করতে যাচ্ছি, যা একটু কঠিন হলেও রোমাঞ্চকরও বটে। এ নিয়ে আলোকপাত করা অনেকটা সায়েন্স ফিকশন বা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ফেঁদে বসার মতো ব্যাপার, যার জন্য প্রয়োজন ক্ষুরধার কল্পনাশক্তি ও অসাধারণ দূরদর্শিতা, যার কোনোটাই আমার নেই। তবু একটা অপচেষ্টা করা যেতে পারে মাত্র।

আধুনিক বিশ্বে ভাষার বিবর্তনের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব সব চেয়ে বেশী। এক সময় যখন বাংলাদেশে ছিলনা কোনো রেডিও বা টেলিভিশন, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়াটা ছিল এক দুরূহ ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, তখন মাত্র পঞ্চাশ-ষাট বা একশ মাইল তফাতে বসবাস কারী মানুষেরাও পরস্পরকে ভিনদেশী হিসেবে বিবেচনা করত। আর ঐ দূরত্ব কয়েকশ মাইল হলে তো আর কথাই নেই, একেবারে বিদেশী কিংবা ভিনগ্রহ বাসী হিসেবে একে অপরকে দেখা হত। তাদের ভাষার উচ্চারণ রীতি ছিল আলাদা, খাওয়াদাওয়া আর রন্ধন কৌশল ছিল আলাদা, পোশাক-আশাকের মধ্যেও থাকত চোখে পড়ার মতো ভিন্নতা। পরস্পরকে এক অদ্ভুত ধরণের আগ্রহ আর সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হত। তাদের মধ্যে বিশ্বাস ও বন্ধুত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হওয়াটা ছিল শক্ত এক ব্যাপার। ক্রমশ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ব্যাবসা বাণিজ্য, রুটি রুজি আর অন্যান্য নানাবিধ প্রয়োজনে জন্মস্থান ছেড়ে মানুষ প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। বেতার ও টেলিভিশনের বদৌলতে মানুষ একে অপরের কাছাকাছি চলে আসতে আরম্ভ করল, এক অভিন্ন সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হতে শুরু করল আপামর জনগোষ্ঠী। অবিশ্বাস দূর হতে আরম্ভ করল। বৈবাহিক বন্ধন এই একতাকে আর ও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে শুরু করল। বিভিন্ন অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে আগের চাইতে অনেক বেশী একতাবদ্ধ একটি অখন্ড

বাঙ্গালী জাতি গড়ে উঠল, যার ভিত্তি ছিল মাতৃভাষা বাংলা ভাষা । আমরা সবাই জানি যে, মাতৃভাষার জন্য মানুষ প্রাণ দিয়েছিল । এই নুতন জাতীয়তা বোধের উন্মেষ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পেছনে প্রবল ভাবে কাজ করেছিল । আর বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার উদাত্ত ডাক সেই জাতীয়তা বোধকে স্ফুলিঙ্গের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিল, বিজয় হয়ে উঠেছিল অবধারিত ।

বাংলাদেশে আজ থেকে সাতচল্লিশ বছর আগে অর্জিত স্বাধীনতা বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও সংস্কারে বিশাল ভূমিকা রাখার সূচনা করেছিল, যে ইতি বাচক প্রতিক্রিয়াটি আজও অব্যাহত । স্বাধীন বাংলাদেশে সবাই তাদের নিজস্ব আঞ্চলিকতার বেড়া পেরিয়ে, স্ব স্ব দেহাতী কথ্য রীতি বর্জন করে দ্রুত গতিতে আধুনিক বাংলা ভাষার ধারক-বাহক এক সুসভ্য বাঙালী জাতিতে পরিণত হয়ে গেল, এমনটি নয় এবং তা কাম্যও নয় । বরং সেই সকল স্থানীয় বাচন ভঙ্গি, আঞ্চলিক উপভাষা ও সংস্কৃতি বাংলা ভাষার প্রাচীন ঐতিহ্যের অংশ বিশেষ, যা নিয়ে আমরা গর্ব বোধ করতে পারি । কিন্তু তারপরও বলা যায় যে, স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে বাংলা ভাষার যে বিশাল এক চলমান সার্বিক সংস্কার প্রক্রিয়ার সূচনা হল, তা এক বিরাট অর্জন । এটা আমাদের স্বাধীনতার সুফল ।

ব্যাপার হল, বর্তমানে যে রকম অকল্পনীয় ধরণের উর্দ্ধগতিতে প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটছে, তাতে করে আগামী পঁচিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ সহ গোটা বিশ্বেই মানব জাতির সামগ্রিক সমাজ কাঠামো একেবারেই পাল্টে যাবে । তার প্রভাব বাংলা ভাষার ওপরেও পড়বে । কারো ব্যক্তিগত বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাসের ধার না ধেরেই যে ব্যাপার গুলি অদূর ভবিষ্যতে ঘটতে চলেছে, তা হল, মেশিন ও সফটওয়্যার মানুষের পেশাভিত্তিক শতকরা ৭০-৮০ ভাগ কাজই কেড়ে নেবে, যার ফলে বেকারত্বে সয়লাব হবে নগর ও বন্দর সমূহ । আর গ্লোবাল ওয়ার্মিং জনিত কারণে যেভাবে সমুদ্রের জল ফুলে ফেঁপে উঠছে, তাতে করে উপকূলের নিকটবর্তী এলাকা সমূহ সাগরের নীচে চলে যাবে । ফলে সারা পৃথিবীর মানচিত্রই যাবে পাল্টে । তাছাড়া দেশে দেশে জনসংখ্যাও আরও বাড়বে । এই নতুন এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে কেবল বাংলা ভাষা নয়, বিশ্বের অন্যান্য ভাষাগুলির ওপরও কি ধরণের প্রভাব পড়তে পারে, তা একবার খতিয়ে দেখা যাক । আসলে একটি ভাষা কেবল মানুষের ভাবের আদানপ্রদানের মাধ্যম নয় । ভাষা কেবল পুঁথিগত কোন বিষয়ও নয়, যা শুধু ব্যাকরণের মোড়কে আবৃত হয়ে থাকে । ভাষা অবস্থান করে মানুষের চিন্তা চেতনায় ও মস্তিষ্কে, ভাষা বসবাস করে মানুষের হৃদয়ে । মানুষের সঙ্গীত, চারু ও কারুকলা, রন্ধন প্রণালী, উৎসব ও পাবন, বিবাদ ও বাকবিতন্ডা এবং তার প্রতিটি কার্যকলাপ জুড়ে ভাষা বিরাজ করে ।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, অতীতের চেয়ে বর্তমানে মানুষের গড় আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটলেও অশান্তি ও উদ্বেগের মাত্রা গেছে বেড়ে । অথচ অতীতের চেয়ে মানুষের বই পড়ার অভ্যেস নাকি গেছে কমে । তার মানে, উদ্বেগ মানুষের বই পড়ার অভ্যেস কমিয়ে দেয় । যেহেতু ভবিষ্যতে সমগ্র মানবজাতিসহ বাংলাভাষীদেরও গড়পড়তা উদ্বেগ যাবে বেড়ে (যার কারণগুলি উপরের অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে), সেই হেতু ২০৫০ সাল নাগাদ বাঙ্গালীর বই পড়ার অভ্যেস খুবই হ্রাস পাবে । রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শওকত আলী, সেলিম আল-দীন, প্রমুখের মতো নতুন নতুন বিশাল সাহিত্য প্রতিভা বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে তখন আর জন্মাবে না । তবে তখন কেউ ভাল লেখক হতে চাইলে তাকে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিষয় সমূহেও গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে ।

পাঠকের সংখ্যার শতকরা হার যদিও তখন অনেক কমে যাবে, কিন্তু সেই সময় ইন্টারনেট ভিত্তিক ব্লগার শ্রেণীর লেখক ও কবির সংখ্যা এত বেশী হবে যে, লেখক ও পাঠকের মধ্যকার সীমারেখা একেবারেই তিরোহিত হয়ে যাবে । অর্থাৎ যাদের মধ্যে তখন সাহিত্যচর্চা চালু থাকবে, তাদের সবাই যুগপৎ ভাবে লেখক ও পাঠকে পরিণত হবে । অন্যান্য সকল ভাষার সাহিত্য সহ বাংলা সাহিত্যও তখন পুরোপুরি ভাবে ভিডিও ভিত্তিক হয়ে যাবে, যার চৌহদ্দি কেবল নাটক আর খন্ড চলচ্চিত্রের মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়বে । আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানুষের ভাবের আদান প্রদানের অঙ্গনে বিপ্লবী সব সফলতা ও বিজয় অর্জিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে ২০৫০ সাল নাগাদ সফটওয়্যার ভিত্তিক অনুবাদ ব্যবস্থার অভাবিত কীর্তির ফলে অন্যান্য সকল ভাষার মতো বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সামগ্রীও তখন শতকরা ৯০ ভাগ অনুবাদ কেন্দ্রিক হয়ে পড়বে । শিক্ষিত মানুষের সংখ্যার হার আরও বেড়ে যাবে এবং

ইন্টারনেটের ব্যবহারিক প্রয়োগ আকাশচুম্বী হয়ে যাবে বলে মানুষ কাগুজে পত্র পত্রিকা আর পড়বে না। ২০৫০ সাল নাগাদ বাঙ্গালীর মুখের ভাষা বাংলা ভাষায় অগণিত বিদেশী (বিশেষত ইংরেজি) শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটবে। হিন্দি ভাষার আঞ্চলিক আধিপত্য ও ইংরেজি ভাষার আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বের পটভূমিতে বাংলা ভাষা মারাত্মক ভাবে আগ্রাসনের শিকার হয়ে নিজস্বতা ও মৌলিকত্ব ভীষণভাবে হারিয়ে ফেলবে।

যেহেতু ভাষার মান নিয়ন্ত্রণের ভার নির্দিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানের হাতেই আর তেমন ভাবে থাকবে না, সেইহেতু সঠিক বানান ও বাক্যরীতির ধার আর তখন বাঙ্গালীরা ধারবে না। বাংলা একাডেমী ও এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান গুলি তখন স্রেফ সীমাবদ্ধ কাগুজে দায়বদ্ধতার মধ্যেই টিকে থাকবে। মিডিয়ার বদৌলতে এবং দেশবিদেশের মাটিতে বাঙ্গালীর অব্যাহত অভিবাসন প্রক্রিয়ার জের বশত কথ্য বাংলাভাষার আঞ্চলিক রূপগুলি ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাবে এবং ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে ও পশ্চিমবাংলায় একটি করে আদর্শ কথ্য বাংলার ছাঁচ পুরোপুরি ভাবে সৃষ্টি হয়ে যাবে (এই প্রক্রিয়াটি বর্তমানে চলছে)। যদি অখন্ড বাংলা তৈরি না হয় (যা একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বিষয় এবং যে প্রসঙ্গটি এই আলোচনায় না নিয়ে আসাই সমীচীন), তাহলে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলাতে ২০৫০ সাল নাগাদ সৃষ্ট আদর্শ কথ্য বাংলার উপরোক্ত ছাঁচের দুটি নমুনার মধ্যে তখনো বেশ পার্থক্য থাকবে। অন্যথায় অখন্ডবাংলায় একটিমাত্র আদর্শ কথ্য বাংলা ভাষার ছাঁচ তৈরি হয়ে যাবে।

বাংলা ভাষী বিশাল এক জনসংখ্যার কারণে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলা ভাষা হয়ত বিলুপ্ত হয়ে যাবে না, কিন্তু তার সার্বিক চেহারা তখন বর্তমান বাংলা ভাষার থেকে খুবই ভিন্নতর হবে। গত একশ দেড়শ বছরে বাংলাভাষার যতো টুকুনা বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটেছে, আগামী বত্রিশ বছরে তার চেয়ে অনেক বেশী বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটবে। কোন যাদুমন্ত্র বলে কিংবা টাইম ট্রাভেল মেশিনে করে যদি আমাদের বর্তমান সময় থেকে কেউ ২০৫০ সালে চলে যেতে সক্ষম হয়, তাহলে তার কাছে মনে হবে যে, সে আর এই পৃথিবীতে নেই, অন্য কোন জগতে এসে পড়েছে।

ভাষা এমন কথা বলে

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

৭ই জুন, ২০১৮ । সময় সকাল নটা ছেচল্লিশ । আমার চালাক দূরভাষটি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ বেশ ধন্ধে পড়লাম । ধন্ধের কারণ হল দূরভাষে ফুটে ওঠা এক বার্তা । পরিচিত এক ভদ্রলোক নিজের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত 'ভানুসিংহের পদাবলী'র নাচ গানের একটি ভিডিও ক্লিপ পাঠিয়েছিলেন দিন দুয়েক আগে । দেখে বেশ লেগেছিল । সে কথা তাঁকে জানাতে তার জবাবে তিনি বার্তা পাঠালেন 'than Q-love to C U কাল বিকেলে ।' ভাষা ও শব্দের বানান দুইই বেশ অভিনবত্বের দাবী রাখে । ভেবে দেখলাম নানাবিধ social media-র কল্যাণে বাংলা ভাষায় এইরকম শব্দপ্রয়োগ খুব নতুন ব্যাপার নয় । মেসেঞ্জার, টুইটারে নিত্য নিয়মিত বার্তা বিনিময় হচ্ছে । চটজলদি এইসব বার্তা পাঠাতে গিয়ে আশ্রয় নিতে হচ্ছে সংক্ষিপ্ত শব্দ আর অন্যরকম বাক্যগঠনের ।

ভাষা আবিষ্কারের গোড়ার কথা হল মানুষের নিজের চিন্তা ভাবনা অন্য সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাওয়ার সহজাত ইচ্ছা । গুহার দেওয়ালে ছবি এঁকে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ যোগাযোগ করত তার সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে । ফুটিয়ে তুলত নিজের আবেগ । ভাষা বা শব্দের কোন ধারণাই তাদের ছিল না । সময় এগিয়ে চলেছে । বিবর্তিত হচ্ছে সভ্যতা । ভাষা আবিষ্কারের দিন অনেক পিছনে ফেলে এসেছি আমরা । বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে বদলেছে আমাদের যোগাযোগের যন্ত্র-মাধ্যম । সোশ্যাল মিডিয়া আর ইনটারনেট আবিষ্কারের ফলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে যোগাযোগের জগতে । সেই পরিবর্তনের প্রভাব খুব স্বাভাবিক কারণেই প্রভাবিত করেছে ভাষাকে । বাংলা ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয় । আর তারই নমুনা দূরভাষের ওই বার্তা । ফেসবুক আর হোয়াটস আপ এর যুগে 'পোস্টান' বাংলা ভাষায় এক নতুন ক্রিয়াপদ ।

প্রযুক্তিগত উন্নতির সাথে সাথে যে শব্দটির সঙ্গে সারা বিশ্ব এখন পরিচিত তা হল বিশ্বায়ন । ১৯৯১ সালে ভারতও বিশ্বায়নের সামিল হল । সরকারের উদারনীতি ও বিশ্বায়নের প্রভাব শুধু দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রইল না । জাতীয় সংস্কৃতিতেও তার ছাপ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল । আর কে না জানে যে কোন জাতির সংস্কৃতির ভিত্তিমূল হল তার ভাষা । একবিংশ শতকের বাংলা ভাষা এর ব্যতিক্রম নয় । অনেক বছর আগেই ভৌগোলিক সীমার বেড়া ডিঙিয়েছে এই ভাষা ।

'মা, Where did you keep the মিষ্টিস that Baba brought from India?' ষোড়শী কন্যার প্রশ্নের উত্তরে মা বললেন, 'ফ্রীজের মধ্যেই আছে । একটু মন দিয়ে খুঁজে দেখলেই পাবে ।' কিছুক্ষণ পরেই আসার কথা কন্যার বান্ধবীর । তাই নলেন গুড়ের সন্দেশ খাওয়ার প্রভূত ইচ্ছা থাকলেও মিষ্টির বাক্স খোঁজায় তার মন নেই মোটেই । প্রজাপতির মতো ছটফটিয়ে আবার সে প্রশ্ন করল, 'Are they in a box? Which box is it – the লাল হলুদ striped one or the চকচকে silver one?' প্রবাসী মা মেয়ের এই সংলাপটি শুনতে অস্বাভাবিক লাগছিল না একেবারেই । মজার কথা হল মা মেয়ের বাক্যবিন্যাসে যথেষ্ট তফাৎ থাকলেও সংলাপে ছন্দপতন ঘটে নি মোটেও । প্রজন্মের ব্যাবধান পার হয়ে একে অপরের ভাষা বেশ সহজেই বুঝতে পারছে । এই মেয়েই মন দিয়ে শোনে চাঁদের পাহাড়, সদাশিবের নানা কাণ্ড, ফেলু দা আর মনোজদের অদ্ভুত বাড়ী । শুধু দেখেই না, বেশ উপভোগ করে ব্যোমকেশের গল্প অবলম্বনে নির্মিত বাংলা ছায়াছবি বা সবুজ দ্বীপের রাজা । ইউ টিউবের কল্যাণে শোনে রবীন্দ্রসঙ্গীত বা পছন্দের লোকগান । তার এইসব ভাললাগাগুলো অনেকটাই উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া । দেশের বাইরে বেড়ে ওঠা মেয়েটি একদিন ভুলে যাবে তার উৎস ভাষা – মা দিদিমার এই আশঙ্কা অমূলক প্রমাণ করেই বাংলা ভাষার সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ তৈরী হয় । এইরকম আরও অনেক উদাহরণ আছে । বাংলা বই না পড়তে পারলেও এই ছেলেমেয়েরা সিনেমা দেখে, ইউ টিউবে বাংলা গান শুনে ভালবাসতে শিখেছে বাংলাকে । প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলেই সম্ভব হয়েছে এটা ।

তারপর ? ভালবাসলে যা হয় আর কি ! এদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের আগ্রহে বাংলা টাইপ করতেও শিখে ফেলছে নানারকম বাংলা সফটওয়্যারের সাহায্যে । সে বাংলার রূপ কিছু অন্য । তা হোক ! এই পরিবর্তনশীলতা প্রাণের ধর্ম । পরিবর্তনের পথ ধরে এই ভাষা বেঁচে আছে এগারো'শ বছরেরও বেশী ।

২০১৮ তে যে ষোড়শী কন্যা ২০৫০ এ সে হবে ছেচল্লিশের মহিলা । তার সন্তানাদির ভালবাসার বাংলা কেমন হবে ? ইংরাজী, হিন্দী ছাড়াও অন্যান্য ভাষা বাংলা ভাষার নকশী কাঁথায় সুতো হয়ে নকশা তুলবে হয় তো । ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস ব্যক্তিজীবন বা জাতীয় জীবনের ওঠাপড়ার মতোই ঘটনাবহুল । বাংলা ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয় । ইতিহাসের পাতা ওল্টালে জানতে পারা যায় চর্যাপদের 'সান্ধ্য ভাষা' হল বাংলা ভাষার আদি রূপ । তারপর মঙ্গলকাব্য এবং পদাবলীর কবি ও চৈতন্য জীবনীকারদের হাত ধরে এই ভাষার ক্রমিক উত্তোরণ । ভাষার চর্চাকারীদের কাছে লিখিত বাংলা গদ্য তখন এক অপরিচিত রূপ । ইতিমধ্যে দেশের পরিবর্ত্তিত রাজনৈতিক পটভূমিকার প্রভাব পড়েছে ভাষায় । পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী চেষ্টা করেন বাংলা গদ্যের একটি সুনিয়ন্ত্রিত রূপ গড়ে তুলতে । রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমের সাহিত্য প্রতিভার ফলস্বরূপ সৃষ্টি ও বিকাশ হয় বাংলা গদ্যসাহিত্যের । তারপর আসে বাংলা ভাষার ইতিহাসের চূড়ান্ত গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় । বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেয় বাংলা ভাষার নাম । বাংলা ভাগের বেদনার ভার বুকে নিয়েও রবীন্দ্রোত্তর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বহু শক্তিশালী সাহিত্যিকের নিরলস সাধনায় বাংলা ভাষার ধারাটি পুষ্ট হয়ে চলেছে । প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাহায্য করেছে তাদের সেই সাধনাকে । ডিজিট্যাল আর্কাইভের প্রচলন, উন্নত মানের কাগজ আর সে সব রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতির আবিষ্কার, মুখে বলা কথা লিখে ফেলার এ্যাপ ইত্যাদির প্রচলনের ফলে নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছে বাংলা ভাষা চর্চায় ।

কর্মসূত্রে বহু বাঙালী আজ বাংলার বাইরে । আগামী ত্রিশ বছরে সেই সংখ্যা বাড়বে বই কমবে না । তাই অভিবাসী বাঙালীরা ভাষাটির ভবিষ্যৎ গঠনে নিঃসন্দেহে একটি বড় ভূমিকা পালন করে চলেছেন । একটা প্রশ্ন প্রায়ই ওঠে – অভিবাসী বাঙালীর জীবনে এই ভাষাটির স্থান আজ কোথায় ? যে কোন অভিবাসীই আজ দুই জগতের মাঝখানে পা দিয়ে টালমাটাল । তার পরিবারের পরিবেশে সে সনাতনী, 'দেশজ ঐতিহ্যের পটভূমিতে পরিপুষ্ট' । কিন্তু কর্মজীবনে সে প্রবেশ করে বিদেশী ভাষা ও সংস্কৃতি প্রভাবিত পরিমণ্ডলে । এই দ্বিধাবিভাজনের বিরুদ্ধে আপোস করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে অভিবাসী বাঙালী । তার ভাষাচর্চাতেও ছাপ পড়ে সেই ক্লান্তির । ভাবী প্রজন্মের কাছে নিজের মাতৃভাষার রত্নভাণ্ডার উন্মোচিত করতে যতটা শ্রম ও সময় ব্যয় করা প্রয়োজন তার সুযোগ নেই প্রবীণ অভিবাসী প্রজন্মের ।

ফল ? এই প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট গল্প বলি । সময়টা গ্রীষ্মকাল । আমাদের প্রতিবেশী বাঙালী বন্ধুর back yard এ জোর আড্ডা চলছে । হঠাৎ বন্ধুর কিশোর পুত্র বাইরে বেরিয়ে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, What does মিচকে mean?' সমবেত অতিথিরা হেসে আকুল । বাবাও মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে ছেলেকে বুঝিয়ে বললেন, 'মিচকে means someone who is mischievious but hides the mischieviousness well.' ছেলে তৎক্ষণাৎ 'Thought so' বলে বাড়ীর ভিতরে ঢুকে গেল । শব্দটির মানে জানতে চাওয়ার কারণ তার মা বলেছে যে তার ছোট ভাই চঞ্চল কিন্তু দাদা মিচকে । জন্মাবধি যে ভাষা বাড়ীতে ব্যবহার হতে শুনে আসছে সেই ভাষার একটি শব্দের ভাবগত অর্থ বুঝতে কোন অসুবিধে হয় নি বিদেশে বড় হয়ে ওঠা বাঙালী কিশোরটির । কিন্তু যে প্রশ্ন মনকে নাড়া দেয় তা হল বাংলা ভাষা কি কোনদিন এই কিশোরেরও সুরের ভাষা, ছন্দের ভাষা হয়ে উঠবে ? বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে এই কিশোরের মন কি অপু দুর্গার প্রথম রেললাইন দেখার মতো আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠবে ?

এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের গর্ভে । আমাদের কাছে উত্তর নেই । আছে শুধু আশা আর পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তাদের শিকড়ের ঐতিহ্য পৌঁছে দেওয়ার দৃঢ় অঙ্গীকার । শিলাইদহ পোস্ট অফিসের এক অশিক্ষিত পিওন । স্থানীয় লোকেদের কাছে সে গগন হরকরা বলে পরিচিত । সে নিজে গান লেখে, নিজেই সুর দেয় । আর তার সেই গানের গভীর উপলব্ধির কথা শুনে অবাক হন স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ । 'আমার মনের

মানুষ যে রে, আমি কোথায় পবো তারে / হারায়ে সেই মানুষ তার উদ্দেশে দেশবিদেশে বেড়াই ঘুরে / কোথায় পাবো তারে . . . .' এই গান শুনতে শুনতে কবিগুরুর মনে হয়েছে এই সব লোকগীতি, মেয়েলি ছড়া, ব্রতকথা, মাঝিদের গান এইসব সংগ্রহ করে রক্ষা করা দরকার। এই সবই আমাদের সংস্কৃতির উত্তরাধিকার । এই উত্তরাধিকারের অধিকার থেকে আমাদের অভিবাসী এবং নিজের দেশের তরুণ প্রজন্ম যাতে বঞ্চিত না হয় তার জন্য আজ অনেকেই সচেষ্ট। সরকারী বিদ্যালয়গুলি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরাজী তুলে দেওয়ার অপরিণামদর্শিতায় একসময় 'গেল গেল' রব উঠেছিল বাংলা ভাষা বাঁচিয়ে রাখার ও তাকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সম্ভাবনার পথে। সে সংকট আজ কিছুটা লঘু বলে মনে হয় । পরবর্তী প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যদি মূল ভাষায় বাংলা সাহিত্যের মণিমাণিক্যের রস আস্বাদন নাও করতে পারে অনুবাদ আছে তাদের জন্য । বেশ কিছু বাংলা 'ক্লাসিক' ইতিমধ্যে অনূদিত হয়েছে । আরও হবে । অনুবাদের মাধ্যমে রত্নভান্ডারের প্রবেশপথটি অন্তত খুলবে।

যে কোন ভাষা এক বিশাল বৃক্ষ বা বহতা নদীর মতো চলমান । চলমানতাই ভাষাটির সজীবতার সাক্ষ্য বহন করে।

'মহাবীর কাটে বন শুনি বেরুনিয়া জন
আইসে তারা দেশে দেশে হইতে'

এও বাংলা ভাষা । সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মূল রূপ যা দাঁড়িয়েছিল তা থেকে সুকুমার সেন বইটির একটি সংস্করণ সম্পাদনা করেন । উদ্ধৃত পংক্তিদুটি সেখান থেকেই নেওয়া। 'আজ্‌কাল্‌ বাঙ্গালী ভাষা আমাদের মত মূর্ত্তিমান কবিদলের অনেকেরই উপজীব্য হয়েছে, বেওয়ারিস লুচীর ময়দা বা তইরি কাদা পেলে যেমন নিষ্কর্মা ছেলেমাত্রেই একটা না একটা পুতুল তইরি করে খ্যালা করে, তেম্‌নি বেওয়ারিস বাঙ্গালী ভাষাতেও অনেকে যা মনে যায় কচ্চেন; . . . . . ।' এই 'আজকাল' হল ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দ। 'ভূমিকা উপলক্ষ্যে একটা কথা' শীর্ষক ভূমিকা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের অংশ এটি । তারপর অনেক জল বয়ে গেছে বাংলা ভাষার নদীতে । বীজ থেকে জন্মান চারাগাছ বেড়ে উঠেছে শাখা, প্রশাখা, ফুল, ফল নিয়ে। একই ভাষাভাষী দুই দেশ – কিন্তু ভাষা গাছকে লালন করে চলেছে দু দেশেরই মালী । তার রূপ দিনে দিনে পাল্টে যাচ্ছে। কিন্তু আলোর পানে তার প্রাণের চলা আছে অব্যাহত । স্বপ্ন দেখলাম সে গাছ আরও ফলবতী হয়েছে, মহীরূহের মতো বিস্তার করেছে তার ডালপালা । কি তার শোভা ! কি রূপ ! সে গাছ ছায়া দিচ্ছে অগুণতি মানুষকে, প্রজন্মের দূরত্ব আর অবস্থানগত সীমানা পার হয়ে।

'তোমাকে শোনাবো, তাই মাঠ নদী বৃক্ষকে শোনাই
আড়াইশো বছর পরে আমিও কবিতা বেঁধে যাই

এখনো বসেছে মেলা, তাঁবু ভরে সুরকাব্যলোক
কম্বল, শীতের রাত্রি-সম্প্রদায় ভুলে যাচ্ছে লোক

ধন্য ধন্য করে সব-পাখি ডাকে-ভোর হয়ে যায় . . . .
ফকির, তোমার বাংলা জেগে ওঠে আমার বাংলায় !'

আমার দোতারা / জয় গোস্বামী

ভেলায় ভেসে

স্নেহাশিষ ভট্টাচার্য

কলাবতীর সামনের স্ক্রিনে তরঙ্গটা ভেসে এলো, কান আর মন দুটোই বুঝে নিলো বিশ্বামিত্র প্রেরিত প্রভাতী শুভেচ্ছা। নীচে সাইকেল আর ব্যাটারি গাড়ির ঝাঁক। তবে চলছে দিব্যি, গতিশীল। আজকের আকাশটাও পরিষ্কার। আকাশপথে সেক্টর ৮ পৌঁছতে বেশী সময় লাগবে না। দেবাদৃতা আজ তাই আকাশ পথে। ওর ভেলার নাম কলাবতী। পথে পাশ দিয়ে যাবার সময় দেবতনু ওর ভেলা বিশ্বামিত্র থেকে তরঙ্গ পাঠিয়েছে। দেবাদৃতা ও হেসে প্রতিতরঙ্গ প্রেরণ করলো। তরঙ্গ আবার জানান দিলো যে বার্তা প্রাপকের কাছে পৌঁছে গেছে। তরঙ্গের ওঠা নামা বেশ প্রকাশ করছে দেবতনুর খুশী খুশি ভাব। যান্ত্রিক ভাবতরঙ্গ এইভাবে খেলা করার বেশী সময় পাবে না। দপ্তরে পৌঁছে যন্ত্র আর নিজের যন্ত্রণা ভোলা। মুক এক সমাজ, বধির এক সময়।

মার্গে গার্গী, কপিল, অর্জুন, লোপা, মহাশ্বেতা একে একে অনেকের সাথেই তরঙ্গের আদান প্রদান হলো কলাবতীর। রাই, দীপ্ত, সুধাকর, পৌষালি আর বকুল সবাই আজ ভেলা নিয়েই বেরিয়েছে। ১৫ মিনিটের অবসর, ভেলা হাজির হয়ে গেল দপ্তরে। সরকারি স্বাস্থ্য দপ্তরের উচ্চপদে আসিনা দেবাদৃতা। পুরো ভবনটাই জাতীয় পতাকার রঙে রাঙানো, বেশ লাগে দেখতে, সমস্ত সরকারী দপ্তর এখন এই ভাবে রঙিন। ঢুকতে ঢুকতে নিঃশব্দ পরিসরে ওর নিজস্ব যন্ত্রে একটার পর একটা বিভিন্ন তরঙ্গের সুপ্রভাতের বার্তা। তার প্রত্যুত্তরে কি তরঙ্গ প্রেরিত হবে সেটাও যন্ত্রে আগে থেকেই ভরা।

কাজের জগতে প্রবেশ করলো দেবাদৃতা। একটু পড়েই বুঝতে পারলো কেউ একজন বাইরে অপেক্ষা করছে, তরঙ্গ তাই বলছে। ভিতরে আসতে চাওয়ার নিঃশব্দ অনুভূতি। ব্যক্তির যাবতীয় নথি সামনে, প্রশ্নটিও, কারুর মুখেই কোনো কথা নেই, প্রতিটি শব্দ নিখুঁতভাবে তরঙ্গবাহিত হয়ে আছড়ে পড়ছে। সংস্কৃত ভাষার পরিসরে গিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে তৈরি হচ্ছে বাংলা ভাষা, যাকে কম্পনাঙ্কের ভগ্নাংশে ভেঙে তরঙ্গের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছে যন্ত্রের গায়ের ওপর। সবার সাথে যন্ত্র। বর্তমানে অভিযোগ প্রায় নেই ই। যিনি এসেছেন তিনি যুবক। যন্ত্র জানাচ্ছে তার নাম সিদ্ধার্থ ঘোষাল। বয়স ২৮। নিবাস চারুলতা ধাম, ৩৬ নম্বর, মাধবী সরনী, কলকাতা । তার প্রেরিত বার্তা তরঙ্গ জানাচ্ছে যে সে খুব ক্ষুব্ধ যে, কোনো কিছুই লিখিত রূপে দেওয়া যাচ্ছে না বলে। সে বর্তমানে বাংলা ভাষায় ছাপানো ফর্মে সব লিখতে চায়, আর এইভাবে কিছু করা যাবে না বলে যখন কোনো আইন নেই তখন তার কথা কেন শোনা হবে না।

বাড়ির বাইরে বেরিয়ে কর্মস্থল, প্রেক্ষাগৃহ, সমস্ত জায়গাতেই এখন শুধু তরঙ্গ প্রেরিত হয়। মোবাইল কোম্পানি গুলো দেউলিয়া হয়ে গেছে। বাড়ির ভিতরে সকলে নিজের মত কথা বলবার ছাড়পত্র পেলেও সবাই ওই তরঙ্গায়িত জীবনেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এ হেন সময়ে এরকম দাবী এখন যন্ত্র দানবে আটকা রাজনৈতিক দলগুলোও করে না। দেবাদৃতার তরঙ্গ সঠিকভাবে কারন জানতে চাইলে সিদ্ধার্থ বলে বাঙালী হিসেবে বাংলা ভাষাকে ভালোবাসার সুবাদে তার এইটুকু অধিকার কি নেই ? দেবাদৃতা একটু অবাকই হয়। তার তরঙ্গ প্রশ্ন পাঠায় বর্তমানে সকলের সুবিধার জন্যই তো এই ব্যবস্থা। কোনো অভিযোগ নেই, অল্প সংখ্যক মানুষ। পুরো কাজটাই স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়ে চলেছে। একটু চুপ থাকে সিদ্ধার্থ, বলা ভালো ওর যন্ত্র। তার তরঙ্গ একটা মুহ্যমান দুঃখী বাঙালীর প্রতিমূর্তি হিসেবে দেখা দিতে থাকে দেবাদৃতার কাছের যন্ত্রে। একটা হতাশা একটা রাগ সব ফুটিয়ে তুলে এক নিষ্ফল তরঙ্গ যাবার অনুমতি চায়। সব নিয়মগুলো কে একটু এক পাশে সরিয়ে রেখে তার ব্যক্তিগত তরঙ্গের কম্পন নম্বর চেয়ে বসে দেবাদৃতা।

একক মাতৃত্বে যে বড় করে তুলছে নম্বরহীন তরঙ্গের শিশু টিকে, নাম দিয়েছে অলীক। বয়স প্রায় ৩৮ ছুঁই ছুঁই। ঘরে মা বাবা আর অলীক, এখন ৬ বছর। না ও সময় পায়নি কোনো তরঙ্গের সাথে নিজের তরঙ্গকে মিলিয়ে নেবার।

সিদ্ধার্থের কম্পন নম্বর ভেসে ওঠে ।

আজ ছুটির দিন, বৃহস্পতিবার। সপ্তাহের মাঝের দিনটাই ধার্য হয়েছে। আকাশে আজ খুব ভেলা নেই। কিন্তু সাইকেলের খুব ভিড়। সিদ্ধার্থকে দেখা করতে বলেছিল ও। আজ কত বছর পর ও কোনো এক অজানা কারণে শাড়ি আর টিপ, ব্যাটারী গাড়ীতে, কিছুটা পরই তরঙ্গের জানান দেওয়া যে সিদ্ধার্থ কাছেই। একই গাড়িতে। গন্তব্য অনেক পুরোনো একটা জায়গা। গঙ্গার ঘাট। নির্মল নদী প্রকল্প হবার পর গঙ্গা আজ সত্যি নির্মল। মাঝিদের গান আর শোনা যায় না ঠিক, কিন্তু নানান ধরণের যান্ত্রিক বিনোদনের ব্যবস্থা আছে। ওরা সরে এলো একটু দূরে। গঙ্গার ধারে বসার একটু পরেই তরঙ্গ জানান দিলো সিদ্ধার্থর চাহিদা। ওরা দুজনেই কম্পনাঙ্ক থেকে মুক্ত করলো একে অপরকে।

ওরা কথা বলতে শুরু করলো। নিজেদের মাতৃভাষা বাংলায়। দেবাদৃতার মনে হলো কত বছর পরে ও যেন শিকল খোলা পেয়েছে। একটু এলোমেলো সিদ্ধার্থ। উচ্চতা চোখে পড়ে। রোগাটে গড়ন। গায়ের রং উজ্জ্বল। এদিক ওদিক তাকিয়ে ধূমপানের নির্দিষ্ট জায়গা খুঁজে না পেয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা জিন্সের পকেটেই রেখে দিল।

আচ্ছা এইভাবে বাংলা ভাষা যে উবে যাচ্ছে, আপনার কিছু মনে হয় না! সিদ্ধার্থের গলাটা হঠাৎ করেই আছড়ে পড়ে কানে। চোখ তুলে তাকালো ও। দোহারা চেহারার এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা দেবাদৃতা। ধীর গলায় বললো উবে যায় নি তো। এখনই তো বেঁচে উঠলো। এখন তো বাংলায় সব হচ্ছে। আমি আপনি কথা বলছি, সরকারি কাজ হচ্ছে, শিশুরাও শিখছে । একটু অবাক হয়ে সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করে বসলো কেমন করে ? সবই তো যন্ত্রে ভেসে ওঠা, হ্যাঁ ঠিক, কিন্ত সবটাই তো বাংলায়। অন্য কোন ভাষার সাথে মিশিয়ে জগাখিচুড়ি কোন বাংলা তো নয়। আজ আমরা প্রকৃত অর্থে বাংলায় কাজ করি, বাংলায় গান করি, বাংলায় হাসি, এই বলেই চুপ করে দেবাদৃতা। দেখে হাসছে সিদ্ধার্থ। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় ও। থামলেন কেন বলুন। গান গাইতে, হাসতে কেমন লাগে একটু শুনি। ঠিক কথা যোগায় না দেবাদৃতার মুখে।

অনেক গুলো সময় পেরিয়ে এসে বর্তমান সময় প্রযুক্তির হাত ধরে যখন বৈপ্লবিক বদল এলো সমাজের বুকে, তখন হায় হায় রব ওঠেনি যে তা নয়, কিন্ত সুবিধাটাই বেশী হয়ে দেখা দিলো। আকাশ পথের ভেলা, সব আলাদা আলাদা নামের। মানুষ আর কিছু বলতে লিখতে সময় নষ্ট করে না। শুধু ভাবে। আর সেই ভাবনা ছড়িয়ে পড়ে যন্ত্রের মাধ্যমে আর একজনের ভাবনায়, বাংলা ভাষায়। এ এক অভিনব অভিযোজন। মানুষ নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। যথারীতি পুরোনো আর নতুনের মাঝের লোকজন হিমশিম খাচ্ছেন এখনো। তাই বাড়ীর ভিতরে এখনো পুরনো পন্থা একই ভাবে। টিভি, রেডিও, সিনেমা সবেরই হাতিয়ার ওই ভাবনা। হ্যাকার রা কিন্তু এর মধ্যেই সক্রিয়, ভাবনার স্তর গুলো ভেঙে অন্যের ভাবনায় ঢুকে পড়ার কৌশল আয়ত্ত করে ফেলেছে। মানুষ তাই দ্রুত ভাবনা বদলে ফেলছে। যদিও টাকার অঙ্ক এখনো ভাবনার স্তরের সাথে পরিবর্তনশীল হয় নি, কেবল কাজের স্তর আর রোজকার জীবন যাত্রা যন্ত্রময় হয়ে উঠেছে।

না কোন জবাব ছিল না ওর কাছে সিদ্ধার্থের কথার। সত্যি তো কতদিন নিজের গলায় গান গায়নি ও। ঠা ঠা করে হেসে ওঠে সিদ্ধার্থ। গাংচিলটা অনেক দিন পর শব্দ শুনে উড়ে গেল। ভাবনা এসেছে, বাংলা ভাষা ও এসেছে, ভাবনার ইনকিলাব ও বিদ্রোহের ভাবনা ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে, যন্ত্রগুলো সমানে হৃদস্পন্দনের মতো ওঠা নামা করব চলেছে, সরলরেখায় আসবে না আমাদের মত। আমরা যত্ন করি না, আমরা ভালোবাসি না আমাদের, আমাদের ভাষাকে। ম্যাডাম আমরা ইংরাজিতে ভাবি, স্প্যানিশে ভাবি, হিন্দিতে ভাবি, শুধু বাংলা তর্জমা হয়। খোলা গলায় বনলতা সেন আওড়াই না। আমরা হারিয়ে গেছি। বলতে বলতে ছেলেটা এগিয়ে চলেছে, মেঘমুক্ত আকাশে গাঙচিলটা উড়েই বেড়াচ্ছে। কবিতা বলছে ছেলেটা, সব ভাবনা ওলট পালট করে দিয়ে কবিতা বলছে, —

যা কিছু আমার চার পাশে ছিল

ঘাসপাথর

সরীসৃপ

ভাঙা মন্দির

যা কিছু আমার চার পাশে ছিল

নির্বাসন

কথামালা

একলা সূর্যাস্ত

যা কিছু আমার চার পাশে ছিল

কখন যেন গলা মিলিয়ে দিয়েছে দেবাদৃতা, ওর এক সময়ের অতি প্রিয় শঙ্খ ঘোষের ''পুনর্বাসন''

ধ্বংস

তীরবল্লম

ভিটেমাটি

সমস্ত একসঙ্গে কেঁপে ওঠে পশ্চিম মুখে

স্মৃতি যেন দীর্ঘযাত্রী দলদঙ্গল

ভাঙা বাক্স প'ড়ে থাকে আমগাছের ছায়ায়

এক পা ছেড়ে অন্য পায়ে হঠাৎ সব বাস্তুহীন ।

দুটো কম্পন যন্ত্র নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে চলছে বাংলায়, সে ভাব বিনিময় ভালোবাসার, পরের দিন ২১শে জুলাই। ভাষার ভেলায় চেপে ভালোবাসার ডিঙি এক নির্মল আকাশে বৃষ্টির মেঘ পেরিয়ে গঙ্গার জলে ছায়া ফেলতে শুরু করলো।

বাংলা ভাষা ২০৫০

সৌমিত্র চক্রবর্তী

বাংলাভাষা নিয়ে গেল গেল রব আজকাল প্রায়ই শুনতে পাই। যেভাবে চলছে, তাতে আজ থেকে ৩২ বছর পর এ'ভাষার ভবিষ্যৎ আরো সুন্দর হয়ে উঠবে নাকি দৈন্যদশা প্রকট হবে, সে প্রশ্নের উত্তর খোঁজা খুব জরুরী বলে মনে হল।

প্রথমেই আমার নিজস্ব মতামতটা খোলসা করা ভালো। বাংলা ভাষা আছে এবং থাকবে। স্বমহিমাতেই থাকবে। শুধু আবেগের বশে ববলছি না এর কতকগুলো যুক্তিগ্রাহ্য কারনও আছে।

প্রথমত পৃথিবীতে একটি দেশ আছে যার সরকারি ভাষা বাংলা। অতএব রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাংলা ভাষার চর্চা চলবেই। দ্বিতীয়ত, মাতৃভাষা চর্চার অভাব সংক্রান্ত আমাদের যাবতীয় হা-হুতাশ মূলত শহর কোলকাতারপরবর্তী প্রজন্মকে দেখে, কিন্তু তার বাইরেও অনেকটা পশ্চিমবঙ্গ আছে যেখানে আজও বাংলা মুখ্য কথ্য ভাষা।

শহরাঞ্চলে মাতৃভাষা সংকটের পিছনে রয়েছে নাগরিক সমাজের অদ্ভুত দ্বিচারিতা ও স্ব- তঞ্চকতা। একটু বুঝিয়ে বলি, নিজের সন্তানকে ইংরাজি মাধ্যমে পড়াব, যেখানে বাংলাচর্চা নেহাতই গৌণ, তার উপর নম্বরের ইঁদুর দৌড়ে সামিল করাব যাতে সেএকটুও হাঁফছাড়ার সময় না পায়, আবার গ্রীন টি খেতে খেতে আক্ষেপ করব, মাতৃভাষারর বুঁদির গড় রক্ষায় আমাদের প্রজন্মই বোধহয় একা কুম্ভ, এরপর যে কি হবে! এর চেয়ে বড় ভণ্ডামো আর হয়না। আসলে বাংলা ভাষা সংস্কৃতির টিকে থাকা নিয়েযে আর্থসামাজিক নাগরিক সমাজ সবচেয়ে বেশি চিন্তা ব্যক্ত করে, তাদেরই বৃহদাংশ এই সমস্যার বড় কারণ।

তবু বলি, আগেও বলেছি, মাভৈ। বাংলা ভাষা ২০৫০ কেন তার পরেও স্বমহিমায় টিকে থাকবে। আমাদের এই মাতৃভাষার ওপর বিদেশী ভাষার প্রাদুর্ভাব নতুন কিছু নয়। মুঘল বা ব্রিটিশ আমলেও এরকম অনেক বিদেশী শব্দের অনুপ্রবেশ সে সামলেছে অনায়াস দক্ষতায়। শুধু তাই নয় আত্মস্থ করে আরো যুগোপযোগী হয়ে উঠেছে। এখনও তাই হয়ে উঠেছে এবং তাতে চিন্তার কিছু নেই। বিগত কয়েকবছরে একটা পরিবর্তনের পর্যায় চলছে, তাই হয়তো একটু বেশি করে চোখে পড়ছে। ভাষা তার চেহারাচরিত্র বদলাবে, এটাই স্বাভাবিক, বরং স্থবির হয়ে গেলেই বিপদ বেশী।

তবে হ্যাঁ, ভবিষ্যতে কালি কলম কাগজের জায়গায় কি-প্যাড, ট্যাবলেট, মোবাইল ইত্যাদিই হয়তো বেশি করে রাজত্ব করবে। ই-বই, ই-লাইব্রেরীর শরণাপন্ন হবে মানুষ। তাতে ক্ষতি কি ? ভালোই তো ! প্রযুক্তির হাত ধরে বাংলা ভাষা বরং আরো সহজে ছড়িয়ে পড়বে এই ভূবনডাঙার গ্রামে গ্রামে। এটামেনে নিতেই হবে, এবং নির্ভয়ে। সত্যেরে লও সহজে।

চরৈবেতি মন্ত্রে সময়ের সাথে চললে, প্রযুক্তির হাত ধরেই ২০৫০ এ বাংলাভাষা দিব্যি স্বমহিমায় বিরাজ করবে এ বিশ্বজুড়ে। শুধু আগে যে স্বতঞ্চকতার কথা বলেছিলাম, সেটুকু এড়িয়ে যেতে পারলেই বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে আর চিন্তার কারণ দেখিনা। আমাদের প্রিয় এই মাতৃভাষা ঠিকই এগিয়ে যেতে থাকবে স্রোতস্বিনী নদীর মত খুঁজে নেবে তার চলার পথ।

আগামীর বাংলা ভাষা

শমীক চক্রবর্ত্তী

সময়ের সরণী বেয়ে বিভিন্ন ভৌগোলিক সীমারেখার বেড়া টপকে বিভিন্ন মানুষের বিবিধ উচ্চারণ বৈচিত্র্যে, বিবিধ কানের সৌন্দর্যানুভূতিতে ভাষার কথ্য ও লেখ্য রূপ জন্ম নেয়, শৈশব-কৈশোর-যৌবন-প্রৌঢ়ত্ব-বার্ধক্য উত্তরণ ঘটতে থাকে।

তবে, ভাষার মৃত্যু কিন্তু অবশ্যম্ভাবী নয়।

ভাষা যদি মানুষের স্থান-কালের পরিবর্তনের সাথে নিজেকে মেলে ধরতে পারে, বিবর্তিত হতে পারে মূল ধারাকে অক্ষুন্ন রেখে, তবে তার জীবন আরো রূপ-রস-বর্ণে সম্পৃক্ত হতেই পারে।

কিন্তু, এই বিবর্তনই হল ভাষার স্থায়িত্ব সংক্রান্ত সমস্যা ও তৎসংক্রান্ত সমাধানের মূল চাবিকাঠি।

অতিরিক্ত রক্ষণশীলতা যেমন ভাষার স্থায়ীত্বের অন্তরায়, তেমনি অতি নমনীয়তা তার অস্তিত্ব সঙ্কটের প্রধান কারণ হতে পারে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এই দুই সমস্যাই কিঞ্চিৎ পরিলক্ষণীয়।

ভাষার প্রচার ও প্রসারে বিদ্যালয়ের ভূমিকা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাভাষার রক্ষণশীল উদ্যোগ বাংলা মাধ্যম সরকারী বিদ্যালয়ে পরিদৃষ্ট ছিল ইংরাজী বর্জনের মধ্য দিয়ে। তাতে তাৎক্ষণিক প্রশংসা ও জনপ্রিয়তা বাড়লেও ক্ষতি বেশী হয়েছে মনে আমার মনে হয়।

শহরের মধ্যবিত্ত মানুষের সন্তানের ঢল প্রথিতযশা বাংলা বিদ্যালয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ও নিচ্ছে। কিন্তু, ইংরাজী স্কুলগুলিতে পড়া অধিকাংশ বাংলাভাষী ছাত্রছাত্রীরা বাংলাভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে সীমিত জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পাচ্ছে। তাই, তারা অবশ্যই বাংলাভাষার প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে।

বাংলা মাধ্যম উচ্চমানের সরকারী বিদ্যালয় গুলিতে পূর্বের ন্যায় ইংরাজী চর্চার ধারা বজায় থাকলে, আজকের এই পরিস্থিতি অনেকাংশে এড়িয়ে চলা যেত বলে মনে হয়।

স্বল্পজ্ঞানী এই বাংলাভাষীরা আজ SMS ভাষায় বাংলা লিখছে। শুধু ইংরাজী ভাষী বাঙালী নয়, বাংলা মাধ্যমে পড়া বাঙালীদের মধ্যেও এই ভয়ানক ধারা প্রবাহিত। এই অতি নমনীয়তা বাংলা ভাষার অস্তিত্ব সংকটের কারণ হতে পারে।

তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় ২০৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই বাংলাভাষাকে আধুনিক মনন দিয়ে কিভাবে বাঁচানো যেতে পারে?

আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয়, সমস্তভাষার প্রতি সম্মানের চেতনা সর্বত্র প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয় গুলিতে বাংলার পাশাপাশি উচ্চমানের ইংরাজী শিক্ষাও বজায় রাখা দরকার, যাতে বাংলা ও ইংরাজী-দুইয়েরই উৎকর্ষতা বজায় থাকে। তবে, এটি একটি যৌথ প্রয়াস ও অবশ্যই সামাজিক রুচির পরিবর্তনের দাবী রাখে।

একই সাথে বাংলা ভাষায় আরো উৎকৃষ্ট মানের সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্মেষ এটা দরকার। মনে রাখা দরকার, বাংলা ভাষার প্রতি সম্মানের অন্যতম কারণ ছিল বাংলা ভাষায় চর্চাকারী অসংখ্য বাঙালী মনীষীগণ।

সুতরাং, আমাদের উন্মুক্ত থাকতে হবে। বঙ্কিমী-রাবীন্দ্রিক বাংলাভাষা তার রূপ বদলাতেই পারে। আর সেই রূপ সুশ্রীতর বা কুশ্রীতর হতেই পারে। বাংলা ভাষীরা তার বিচার করবেন, সময় তার মূল্যায়ণ করবে। তবে, সমস্ত অবস্থাতেই নিশ্চয় করতে হবে যে বাংলা ভাষীরা যেন কিছুতেই বাংলা ভাষা বিমুখ হয়ে না পড়েন।

''বুঝহ রসিকজন, যে জানো যেমন''

ডালিয়া নিলুফার চৌধুরী

বাঙ্গালীদের বড় সম্বল তার ভাষা । বরাবরই । দারিদ্রপীড়িত দেশ । অভাবে অভাবে শতচ্ছিন্ন মানুষ ! তবু একখন্ড মাটি আর মুখের ভাষাটার জন্যে এই মানুষগুলির বুকভরা কি আশ্চর্য মায়া ! সেই উদ্বেল ভালোবাসায় তারা অল্পে কাঁদে । অল্পেই হাসে । বস্তুতঃ এই নিয়েই তারা বেঁচে থাকে । ভাত কাপড়ের অভাব তাদের কোনদিন কাবু করতে পারেনি । শত্রুর মাথায় চড়া জেদ দেখেও তাকে তুচ্ছ গণ্য করেছে । ভাষার জন্যে বাঙ্গালীর এই আবেগ অফুরন্ত ! তাই মাটি ছেড়ে যত দুরেই থাক, ভাষার জন্যে তাদের মন ডোকরায় । ভাষাকে ঘিরে আবেগময় সেই ইতিহাস তারা বুক দিয়ে আগলে রাখে । বহুকাল পর্যন্ত তাই-ই ছিল । হয়ত এমনই থাকত । কিন্তু সময়ের সাথে সাথে জগতে মানুষের বিচরণের ঘের গেল বেড়ে । রুজি রোজগারের টানে মানুষ চলে যেতে লাগল দূরদূরান্তে । একসময় দূরের মাটিতেই অগুনতি অজানা মানুষের সাথে নিত্য নতুন লেনদেনে তাদের ভাব হয়ে গেল । যাহোক, সেইসব কথায় পরে আসছি ।

গত কয়েক দশক ধরে, জায়গায় জায়গায়, সেই বাংলাভাষার যে পরিবর্তন হয়েছে, তা চোখে পড়ার মত । অনেক সময় যা হতাশার কারণ এবং যথেষ্ট পীড়াদায়কও বটে । দেখা যাবে, কথার মধ্যে কিছু শহুরে, কিছু গ্রাম্য, তারমধ্যে আবার ধবধবে সাদা সাদা কয়েকখানা ইংরেজী আর বিদঘুটে গোটাকতক স্ল্যাং ঢুকিয়ে দিচ্ছে । সব মিলিয়ে কি যে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা !!

কি বলব, দেখি, ২১ শে ফেব্রুয়ারীর ভাবগাম্ভীর্যকে বাদ দিয়ে লোকে মাঠে ময়দানে হৈ হট্টগোল করছে । নাচছে । গাইছে । যেন ঈদ । যেন পুজো । অথচ দিনটি সম্পর্কে দু'চার কথা বলতে যেয়ে, সাংবাদিকের সাধারণ প্রশ্নেই তারা যখন হতচকিত চোখে তাকায়, তখন সত্যি, দুঃখ না হয়েই যায়না ।

দু' এক সময় মনে হয়, এই দুরবস্থা হতোনা যদি ভাষার ইতিহাসটা ঠিকমত জানা থাকত । তবে এ নিয়ে অভিযোগ একটা ওঠালেই লোকে উড়ে এসে উত্তর দেবে, এখনও পর্যন্ত বাপ, দাদার পরে কে আছেন তার হদিসতো দূর, নামটাই জানিনা । বোঝা যায়, ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহ তাদের এই পর্যন্তই । কাজেই দোষাদুষি করে লাভের লাভ কিছু হবে না । আর ইতিহাস জানার দায়বদ্ধতা রাতারাতি তৈরী করাও অসম্ভব ।

জন্মে যেয়েই আমরা বাংলাভাষার ওয়ারিশ হয়েছি, সত্য । তবে এর মান মর্যাদা সেই ভাবে দিতে পেরেছি কিনা, তা নিয়ে মনের মধ্যে সন্দেহ একটা থাকেই । বাংলা ভাষার কপালে এযাবৎ কাল জুটেছে বহুকিছু । বুলেট থেকে শুরু করে তায় তাচ্ছিল্য অবজ্ঞা, অবহেলা । সবই । সময়ে যা দূর্ভাগ্য এবং লজ্জাজনক । কোন দায়বদ্ধতার ধার আমরা ধারিনি । বরং অগ্রাহ্যই করেছি । ব্যাপারটা এইরকম যেন, বাংলার মাটিতে জন্মেছি, তাই বাংলা বলছি । ইংরেজের মাটিতে জন্মালেতো ইংরেজীই বলতাম । এর বেশী কি ? তারপরেও সবদিক সামলে বাংলা ভাষা এখন যথেষ্ঠই পরিণত এবং সম্মনিত । বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পাওয়া স্বীকৃতিগুলি অন্তত ঃ সেই সাক্ষ্যই দেবে ।

যতটুকু বুঝি, ভাষা নিয়ে রক্তারক্তি যা হবার, তা হয়েছে । কাইজ্যা কোন্দলের দিনও শেষ । মানুষ আগের চেয়ে এখন ঢের বেশী সহনশীল । এরমধ্যে 'ইংরেজী' ও আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক অভিভাবকের মত । ফলে আমাদের ভরসার একটা জায়গাও তৈরী হয়ে গেছে । প্রয়োজনতো বটেই, তাছাড়াও ইংরেজী ভাষার আভিজাত্য এবং জৌলুশ এত বেশী যে তাকে সমীহ না করেই পারা যায়না । বলার লোভ সামলানোতো আরও কঠিন । এদিকে, অভিভাবকরাও তাদের ছেলেমেয়েদের ইংরেজী স্কুলে পাঠাবেন, না বাংলা স্কুলে দেবেন, তাই নিয়ে দ্বিধাগ্রস্থ । কোনটা তাদের ছেলেপুলের ভবিষ্যতকে উজ্জলতর করবে সেও এক বিরাট প্রশ্ন ! সেটা হয়ত এই কারণে যে, ভালো বাংলা না জানলে সেটা একটা দুঃখের কথা বটে । কিন্তু ভালো

ইংরেজী না জানলে তার যেন ইজ্জতই বাঁচেনা । তাই শহর জুড়ে নামীদামী সাহেবী স্কুল । যা ব্যায়বহুল হলেও স্বস্তিদায়ক । এদিকে ইংরেজী শিখতে যেয়ে পড়ুয়াদের বাংলা বলার ধরণ ও যাচ্ছে পাল্টে । ইংরেজী ঠিকমত বললেও, বাংলা বলছেন ইংরেজীর আদলে । জড়িয়ে জড়িয়ে । আঠাজটার মত সেই বাংলার মর্যাদা কতখানি থাকে বোঝা মুশকিল । দেখি গান বাজনার মধ্যেও তাই । উচ্চারণের এমনই দূরাবস্থা যে, কানখাড়া করে শুনেও বুঝতে পারিনা, বাংলা না ইংরেজীতে গাইছেন ।

তবে একথা ঠিক, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবার ক্ষমতা আছে বলেই, ইংরেজীর গ্রহণযোগ্যতা দুনিয়াজুড়ে । আরও মানতে হয়, যেহেতু চাকরী বা ব্যবসা বানিজ্যের ক্ষেত্র এখন স্থানীয় থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলে গেছে, তাই সম্পর্কের গন্ডী এখন শুধু বাঙ্গালীতে নয় । দেশের সঙ্গে দেশের । আর সেখানে প্রতিযোগীতার একটা ব্যাপারও থাকে । যে দৌড়ে নিজেদের যোগ্য প্রমাণিত না করলেই নয় । কাজেই এখানে ইংরেজীকে উপেক্ষা করার মানেই হলো, সোজাকথা এক পায়ে দৌড়ানো ।

যাইহোক, কথার মধ্যে কুলীন ভাবটা না থাকলে ভাষা দু'এক সময় উপদ্রবের মতই ঠেকে । সেক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় 'আঞ্চলিকতা' একটা ব্যাপার । অনেক সময় পূর্ববাংলার কথার মধ্যে গেঁয়ো গন্ধ পাওয়া যায় বলে লোকে সোজাসুজি বলে 'বাঙ্গাল' । তবে আঞ্চলিকতার মধ্যে যত গরিবীয়ানাই থাক, তার রসটা উপভোগ করার মত । এই রস ছেকে নিলে যা হবে, তা – 'ছোবড়া' । কাজেই বাঙ্গাল শুনতে রাজী আছি । তবু রস খোয়াতে রাজী নই – এপারের মানুষের অন্ততঃ সেই ইচ্ছা । অবশ্য ওপারের মানুষজন পূর্ববাংলার মত বাংলা বলুক, তাও তারা চায়না । পরিষ্কার বোঝে, রবীন্দ্রনাথের মুখে কি আর 'আইগা যাইগা' আর ''আহেন, বহেন মানাত ? কি বলব, পশ্চিম বাংলার মুখের কথা যেমন ধোয়া কাচা । পূর্ববাংলার কথাগুলির মধ্যে ঠিক তেমনি কাদামাটি মাখানো । তবে ভাষা এক হলেও তা বলার ব্যাপারে- দু'পক্ষই পষ্টাপষ্টি । ভালো হোক, মন্দ হোক, যা বলার তা তারা নিজের মত করেই বলে । আগে বইপত্র, বা যে কোন লেখালেখির ভাষা বলতেই ছিল সাধু । আর কথার জন্যে চলতি । আর এখন বইয়ের ভাষা যা, মুখের ভাষাও তাই । সাহিত্যেও ভাষার কোন বায়নাক্কা নাই । বরং আগের চেয়ে তা নির্মেদ আর সহজ ।

দেখা গেছে, অফিস আদালতে, পথেঘাটে, অঞ্চলে অঞ্চলে বাংলা ভাষার একেক চেহারা । আর পেশার সাথে ভাষার কেমন যেন একটা নীরব সখ্যতা আছে বলেও মনে হয় । চাকুরীজীবি, ব্যবসায়ী, রাজনীতিক, লেখক, কিংবা শ্রমিকের ভাষার ধরণ, সব আলাদা আলাদা । এখানে জ্ঞান এবং জ্ঞানের বাইরে তারা তাদের মেজাজ মর্জী মতই কথা কন । দেখেছি, একহাটু কাদার মধ্যে আটকে পড়া হাতির মত অসহ্য জ্যামে আটকে থাকে বাস । তারপরেও কন্ডাকটরের হাকাহাকি – ''চালু উডেন !! চালু উডেন !!'' আর জ্যাম ছেড়ে গেলেই বলবে ''বারাই বারাই'' । অর্থাৎ সামনে আগাই । ঠিক ঐরকম আশেপাশে গাড়ীর ভীড় দেখলেই ''চাইপ্যা, চাইপ্যা! বেরেক বেরেক'' বলে চিল্লিয়ে উঠবে । তাদের অভ্যাসই এই । মরে গেলেও বলবে না 'জলদী উঠুন' 'সামনে আগাই' বা 'সরে যান', এই জাতীয় কিছু । ওদিকে টিকেট, প্যাসেনঞ্জার, ব্রেক, সিগন্যাল, বাসস্টপ আর 'লেডিস সীটে'র মত ইংরেজী শব্দও তারা অনায়াসে বলে । আর বলতে বলতে এমন হয়েছে যে এগুলোকে এখন আর ইংরেজী শব্দ বলে মনেও হয়না ।

দেখা গেছে নাটক পাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় চত্তর কিংবা সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বাইরে বাংলা ভাষা ইস্তক বড় দূর্বল । তার উপর যেহেতু যন্ত্র ছাড়া মানুষের জীবন এখন বলতেই অচল, তাই ভাষা অনেক সময় প্রাকৃতিক না হয়ে, হয়েছে যান্ত্রিক । যন্ত্রের মগজের মধ্যে ঠেসে ভরে দেয়া ইংরেজীতে ও এমজি, লোল, টিসি, ডব্লু সি, জাতীয় কথাগুলিই তারা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে । মুঠোফোনের ক্ষুদেবার্তায় অতিক্ষুদ্র সেই সব সাঙ্কেতিক কথার মধ্যে কেমন যেন তামাশা তামাশা ভাব । প্রযুক্তির কারণে ভাষার স্থুল পরিবর্তনটা এভাবেই টের পাই ।

আরও যেটা ভাববার বিষয়, সেটা হলো 'স্ল্যাং' । অশ্রাব্য না হলেও যা অন্ততঃ শ্রবণে কটু । নাটক, সিনেমা, আর বিজ্ঞাপনের আশকারা পেয়ে জোস, হেব্বী, কঠ্যিন, পাঙ্গা, ক্যাচাল, ঝাড়ি আর ফাটাফাটির মত শব্দ বাংলা ভাষায় পিল পিল করে ঢুকে পড়েছে । এখনকার উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের মুখ চলতি ভাষাই তাই । বাকীরা নেহাতই অভ্যাসবশে তাকে অনুকরণ করে যাচ্ছেন । এর

ফল কি হবে না হবে, ভাষার সৌন্দর্য তাতে নষ্ট হবে, কি হবেনা, অত খুটে নেটে দেখার সময় তাদের নেই । ওদিকে, ভাষায় জোর খাটানো অসম্ভব বলে, ভদ্র সমাজ একে গ্রহণ করেনি । মেনে নিয়েছে মাত্র । আমাদের মধ্যে অনুকরণ প্রবণতা এত বেশী যে, একে ঠেকানো এক অর্থে মুশকিলই ছিল । এইভাবে ভাষার পরিবর্তনটা সবার আগে যেমন টের পাওয়া যায় তরুণদের মুখের কথা শুনে, তেমনি বোঝা যায় নাটকের সংলাপ আর সিনেমার গান শুনেও । যা শুনলে মনে হবে, বাজার জমানোই তাদের কাজ । ভাষা রসাতলে গেলেও ।

যা হোক, এই অরাজকতা এবং বিশৃংখলতার কারণে ভাষার পরিবর্তন নিয়ে এখনকার সচেতন মানুষের মধ্যে একটা চাপা উদ্বেগ কাজ করছে, বোঝা যায় । সুস্থ্য ভাষা সুস্থ্য চিন্তার ফল । বাংলা হোক আর ইংরেজী হোক । কিন্তু আধুনিক মানুষজন সুস্থ্য চিন্তা করছেন কিনা, সেটাই প্রশ্ন । আজ যে বাংলা ভাষার পরিবর্তন নিয়ে কথা উঠছে, শঙ্কা তৈরী হচ্ছে, তার কারণ একটাই, আমরা আমাদের ভাষা যেভাবে শুনতে চাই, সেভাবে শুনিনা । বুক ঠান্ডা হওয়ার মত কথা কি মানুষ বলে আজকাল ? প্রাণস্পর্শী কিছু ? যা শুনলেই ভিতরটা জুড়িয়ে যায় ? বরং তাদের কথার মধ্যে উদ্বত, বেপরোয়া আর ক্ষিপ্ত মেজাজের ভাবটাই থাকে বেশী । ভাষার সেই নির্দয় রুক্ষতা দিনদিন আমাদের ক্লান্তি আর পেরেশানীর মধ্যে ফেলে দেয় । মাত্র চার দশকের মাথায় মানুষের আশ্চর্য মায়াভরা কথাগুলি কোথায় গায়েব হয়ে গেল, কে জানে ! বস্তুতঃ মানুষের জীবন এখন বলতে গেলে যুদ্ধের সমান । সেই কারণেই কিনা কে জানে, কি শহর, কি গ্রাম, সবখানে যে অস্থিরতা, ভাষার মধ্যেও তা দৃশ্যমান ।

অথচ ভাষা কেবল বলা আর শোনার জিনিষ তো নয় । ভাষা কখনও অস্ত্রের মত । আয়নার মত । আবার কখনও শক্তির মত । তা না হলে, শেখ মুজিবের এক ভাষণ শুনে কি আর এদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ এক মুহূর্তে ঝেড়ে উঠে দাড়ায় ? তারাতো প্রায় মরতে বসা জাতিই ছিল একটা ! অবশ্য ঐ উঁচু পার্লামেন্টে বসা এখনকার রাজনীতিবিদদের ভুল উচ্চারণে অমার্জিত ভাষার ব্যবহার দেখে কেবল আশাহত হই । একে শুদ্ধ করবে কে ? তাই ভাষা আক্ষরিকভাবে শুদ্ধ হলো কি অশুদ্ধ হলো, তারচেয়েও জরুরী ভাষা সুভদ্র হলো কিনা, তা দেখা ।

২০৫০ সাল অর্থাৎ আর ত্রিশ বছর পর, বাংলা ভাষার চেহারাটা ঠিক কেমন হবে, তা হয়ত অক্ষর দিয়ে পুরোপুরি এঁকে দেখানো সম্ভব নয় । যতটুকু আন্দাজ করি, আকাশ পাতাল, পরিবর্তন কিছু না হলেও দেখা যাবে, এখন দুটো স্ল্যাঙ বললে তখন হয়ত দশটা বলছে । আজ যারা ভাঙা ভাঙা ইংরেজী বলছে, তারা হয়ত তখন গোটা লাইনটাই বলে ফেলবে । ভাষায় প্রভাবিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় । তার উপর মানুষের সাথে মানুষের আজকাল তারে তারে যোগাযোগটা এত বেশী ঘনিষ্ঠ যে ঘর এবং ঘরের বাইরে শিক্ষা, বৈবাহিক সম্পর্ক, বিনোদন, এবং ব্যবসায়িক লেনদেনের সাথে সাথে ভাষারও সার্বক্ষণিক একটা নিরব লেনদেন ঘটে যাচ্ছে । যা খুবই স্বাভাবিক । তবে প্রশ্ন হলো, সেই লেনদেন মাত্রার মধ্যেই থাকবে কিনা । মোটকথা, ভাষার প্রতি অবজ্ঞা বেশী করছি, না যত্নটা বেশী নিচ্ছি এই দুয়ের অনুপাত দেখলে বোঝা যাবে ভাষা নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার কারণ আছে কি নেই ।

ভালোবাসা আর যত্ন না পেলে মানুষ যেমন মানুষ হয়না, তেমনি ভাষাও তার শ্রী হারিয়ে ফেলে । কাজেই সবার আগে যত্নটা দরকার । আশার কথা এই যে, বাংলা ভাষার দূর্দশা ঘোঁচাতে, দেশে বিদেশে কিছু মানুষ এখনও পর্যন্ত নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন । তাদের সংখ্যাটা কম । কিন্তু শক্তিটা অবিশ্বাস্য ! তাদের নিষ্ঠা, যত্ন আর পরিশ্রম বাংলা ভাষাকে সেই উচ্চতায় নিয়েও গেছে । মিলেছে স্বীকৃতি, সম্মান । যে সম্মানকে বিধাতার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ ভেবে, বাংলা ভাষার ঐশ্বর্যময় মুখটা মনে করে, পুরনো সেই বুকভাসা আনন্দকে আবারও টের পাই ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের
শুভেচ্ছা